বিশেষ সংখ্যা

জুলাই- আগস্ট ২০২৫ ■ আষাঢ়- শ্রাবণ- ভাদ্র ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ঝরে পড়া ফুলগুলো

RjvB MY-Afi¨Ìv‡b kwn` wkï‡`i Ici cvgvY¨ Mš'



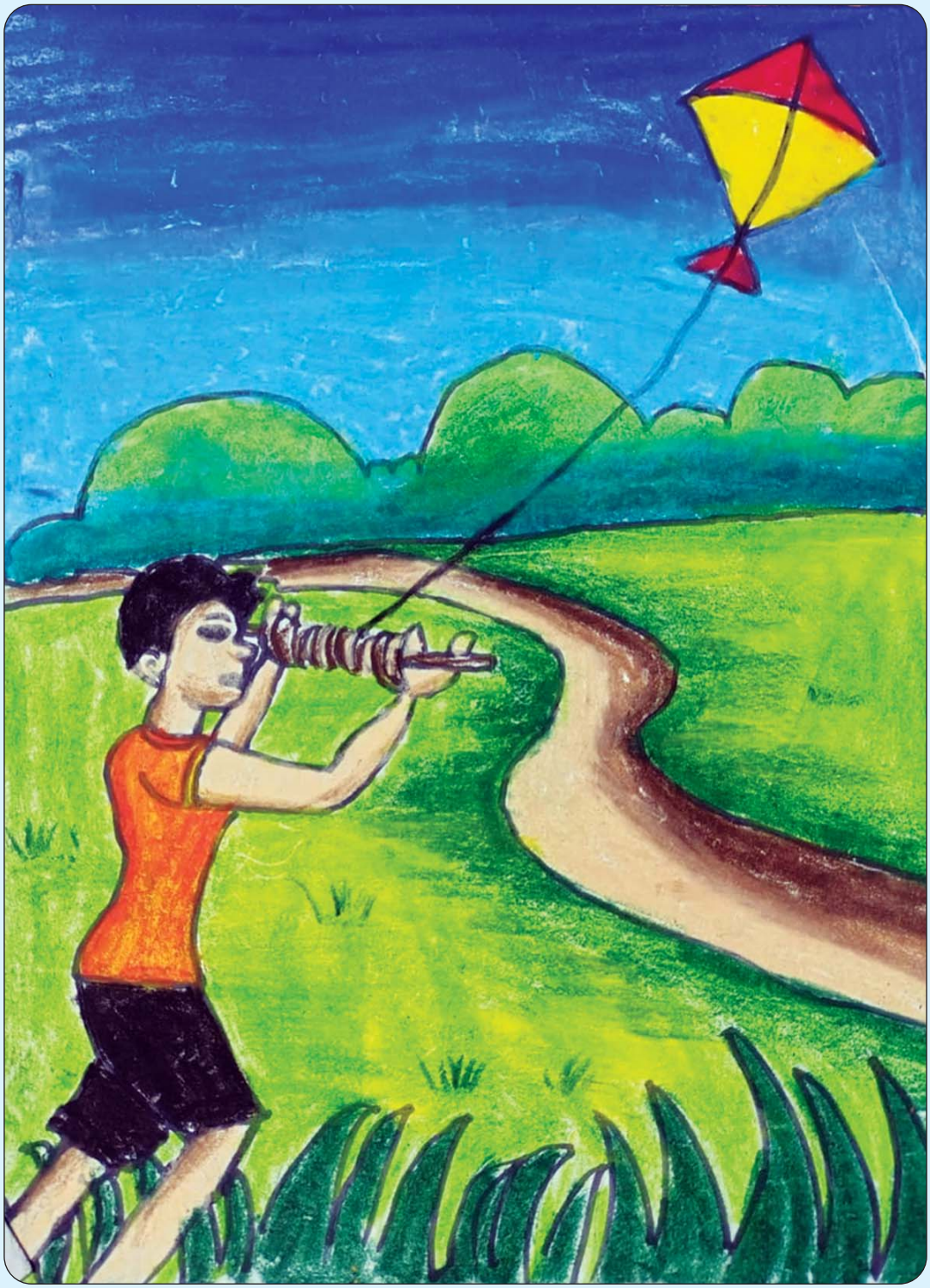

হুরাইন হক কাশফিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নবারুণ

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল:
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ৪০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা ২০১৮ সালে হলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তখন চাকরিতে কোটা তুলে দেয় সরকার। ২০২৪ সালের ৫ই জুন হাইকোর্টের এক রায়ে কোটা পুনর্বহাল হলে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' ব্যানারে শুরু হয় নতুন আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে ২রা জুলাই থেকে মিছিল-সমাবেশ শুরু করে। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগকে কেন্দ্র করেই চলছিল শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি। ধীরে ধীরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী থেকে জেলা শহর, মহল্লা থেকে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত।

আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পেশাজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি শিশু-কিশোররাও অংশ নেয়। তাদের কেউ পরিবারের সঙ্গে, কেউবা নিজের স্কুলব্যাগ নামিয়ে, কেউবা মা-বাবার নিষেধ উপেক্ষা করে, আবার কেউ পরিবার থেকে লুকিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তারা রাস্তায় নেমে আসে। সশরীরে অংশগ্রহণ ছাড়াও শিশু-কিশোরদের কেউ কেউ বাসায় ও বাসার ছাদে খেলতে থাকা অবস্থায়, বাসা থেকে বিক্ষোভ দেখার সময় এবং মা-বাবার সঙ্গে বিজয় মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে শহিদ হয়েছে। যেভাবেই হোক না কেন, তাদের সাহসী অংশগ্রহণ ছিল আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি। এ থেকে বোঝা যায়, আন্দোলনটি শুধু কোটা সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও মিশে গিয়েছিল এর সাথে।

গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া অনেক শিশু-কিশোরদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শিশুরাও ছিল। তারা ছিল স্বপ্নে ভরা হাসিমাখা ভবিষ্যতের প্রতীক। শিশুদের হাতে ছিল না কোনো অস্ত্র, ছিল শুধু স্বপ্ন। তবুও ফ্যাসিস্ট সরকার এতটাই নিষ্ঠুর হয়েছিল যে গুলিতে নিষ্পাপ শিশুদের বুক ঝাঁঝড়া করতে এক মুহূর্তও ভাবেনি। গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পেরিয়ে গেলেও আজও সেই শিশু শহিদদের নিষ্পাপ ছবি আমাদের হৃদয়ে আগুন জ্বালায়, প্রতিজ্ঞার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে বলে- অন্যায়ের প্রতিশোধ আমরা নেবই। এই শিশু শহিদরা আমাদের আন্দোলনের অনুপ্রেরণা, লড়াইয়ের জ্বলন্ত শিখা। তারা আমাদের সাথে নেই, তবু আছে হৃদয়ে, অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটায়, প্রতিটি বিদ্রোহে। এই ইতিহাস ভুলব না আমরা, ভুলবে না বাংলাদেশ। তারা ফুল হয়ে ফুটে আছে আমাদের মনে। তাদের আত্মত্যাগের সুগন্ধ ছড়িয়ে গেছে বাংলার বাতাসে, মানুষের প্রতিবাদের স্লোগানে। বাংলাদেশ যতদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখবে, ততদিন এই কোমলমতি শহিদদের নাম মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে।

জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ শিশুদের স্মৃতির পাতায় অমর করে রাখতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব মোঃ মাহফুজ আলম-এর পরামর্শে সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা নবারুণ নিয়েছে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। জুলাই-আগস্ট ২০২৫ সংখ্যায় সরকারি গেজেটভুক্ত সকল শিশু শহিদদের নাম, আইডি নম্বর, গেজেট নম্বর এবং তাদের শহিদ হওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। এ উদ্যোগ নবারুণ বন্ধুদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে–এমনটাই প্রত্যাশা। ভালো থেকো বন্ধুরা, নবারুণের সাথেই থেকো।

সূচি

ঢাকা বিভাগ

জাবির ইব্রাহিম ৫
মো. গোলাম নাফিজ ৬
শাহরিয়ার খান আনাস ৭
মো. নাঈম ৮
মেহেদী হাসান ৯
মো. আহম্মেদ আব্দুল্লাহ ১০
মো. মাহমুদুল হাসান জয় ১২
মো. ইয়ামিন চৌধুরী ১৩
মো. ইব্রাহিম খলিল ১৪
লিটন হাসান ১৫
শাহরিয়ার হাসান আলভি ১৬
আরিফ ১৭
মো. ইমন ১৮
জিল্লুর শেখ ১৯
মো. নুর হোসেন পিয়াস ২০
আবদুল মোতালেব ২২
ইমন মিয়া ২৩
মো. শাফিক উদ্দিন আহমেদ (আহনাফ) ২৪
মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ ২৫
রাকিব হোসেন ২৬
মো. ইয়াসির সরকার ২৭
নাসিব হাসান রিয়ান ২৮
মমিন ইসলাম ৩০
মো. রুস্তম ৩২
মো. সাদ মাহমুদ খান ৩৩
মো. আদিল ৩৪
রাহাত হোসেন শরীফ ৩৫
মো. সামিউল আমান নূর ৩৬
ফয়জুল ইসলাম রাজন ৩৭
রিয়া গোপ ৩৮
তাহমিদ ভূঁইয়া ৪০
আব্দুল আহাদ ৪১
তামীম শিকদার ৪২
মো. হাসিবুর রহমান ৪৩
তাওহীদ সন্নামত ৪৪
বাঁধন ৪৫
মো. সিয়াম ৪৬
তামিন হৃদয় ৪৭
মারুফ মিয়া ৪৮
আরাফাত মুন্সী ৪৯
মো. মোবারক হোসাইন ৫০
নাফিসা হোসেন মারওয়া ৫২
মোহাম্মদ রায়হান ৫৩
ফারহান ফাইয়াজ রাতুল ৫৪
খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ ৫৫
শেখ মাহাদী হাসান জুনায়েদ ৫৬
মুজাহিদ ৫৭

সিলেট বিভাগ

মো. হাসাইন মিয়া ৫৮
নাহিদুল ইসলাম ৫৯

রাজশাহী বিভাগ

আস-সাবুর ৬০
মো. তারিক হোসেন ৬১
মো. মাহাবুব হাসান নিলয় ৬২
মো. জুলকার নাইন ৬৩
মো. সাব্বির হাসান ৬৪
মো. আব্দুল আহাদ সৈকত ৬৫
সিয়াম শুভ ৬৬
মোছা. রিতা আক্তার ৬৮
মো. মিনহাজ হোসেন ৬৯
মিকদাদ হোসাইন খান ৭০
মো. জুনাইদ ইসলাম রাতুল ৭১

বরিশাল বিভাগ

মো. সিফাত হোসেন ৭২
সরোয়ার হোসেন শাওন ৭৩
রাকিব হাওলাদার ৭৪
মো. আমিন ৭৫
মো. ইয়াসিন ৭৬
বাহাদুর হোসেন মনির ৭৮
ওমর ফারুক ৭৯

খুলনা বিভাগ

সামিউর রহমান সাদ ৮০
মো. রিয়াদ শেখ ৮২
মো. খালিদ হোসেন শান্ত ৮৩
মো. সাকিবুল হাসান মাহি ৮৪
মো. মেহেদী হাসান আলিফ ৮৫
মো. ইউসুপ আলী ৮৬
মো. আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিম ৮৭
মো. উসামা ৮৮
মো. মাহিম হোসেন ৮৯
আলিফ আহমেদ সিয়াম ৯১
ইয়াসিন শেখ ৯২
আহাদ আলী বিশ্বাস ৯৩
মাহাফুজুর রহমান ৯৪

চট্টগ্রাম বিভাগ

মো. জিহাদ হাসান ৯৫
মো. রিফাত হোসেন ৯৬
সাহাদাত হোসেন ৯৭
নাঈমা সুলতানা ৯৮
আশিকুর রহমান ১০০
মোহাম্মদ ইসমামুল হক ১০১
সাদ আল আফনান ১০২
ইউনুছ আলী শাওন ১০৩
ইফাত হাসান খন্দকার ১০৪
মোহাম্মদ সজিব ১০৫
আবদুল কাইয়ুম ১০৬
মো. হাসান ১০৭
মো. আরাফাত হোসেন আকাশ ১০৯
শাহাদাত হোসেন শাওন ১১০
মো. মাহিন ১১১

রংপুর বিভাগ

মো. সোহাগ ১১২
মো. জোবায়ের হোসেন ১১৩
মো. গোলাম রব্বানী ১১৪
মো. আশিকুল ইসলাম ১১৫
রবিউল ইসলাম রাহুল ১১৬
আশরাফুল ইসলাম অন্তর ১১৭

ময়মনসিংহ বিভাগ

আব্দুল্লাহ আল মাহিন ১১৮
মো. জুবাইদ ইসলাম ১১৯
মো. শাকিবুল হাসান সাজু ১২০
সামিদ হোসেন ১২২
আহাদুন ১২৩
সোহাগ মিয়া ১২৪
জোবায়েদ ১২৫
সাফওয়ান আখতার ১২৬
মো. লিটন ১২৭

ছোটোদের ছড়া

আবীর মাহমুদ/ মো. ইসমাঈল হোসেন ২১
মো. আহনাফ হোসেন/মো. মুজাহিদ/ মো. নাজমুল হাসান সানি ৫১

আঁকা ছবি

হুরাইন হক কাশফিয়া/দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
আদনান তালুকদার তন্ময়/ইয়াকুব বর্ণ/ তৃতীয় প্রচ্ছদ
তাসনিম জাহান রাদিয়া/ আরিয়ান ইসলাম সোহান ১১
নাফিসা তাসনিম স্নেহা/আশরাফি তাহসিন ২৯
নাজিবা তাহসিন, শারিকা তাসনিম ৩১
রোকাইয়া সুলতানা রাহিকা ৩৯
জাকোয়াত খান/ সাবিত ইসলাম ৬৭
মাশরুর সাহজায়ীব সৌমিক/রুফাইদা বিনতে মনজুর ৭৭
আবিদা ইসলাম/ নিমিত ৮১
আরিকা আজিজ ফারিন/হিমাদ্রী দে ৯০
ফারিয়া আক্তার/জাবিয়া তাসনীম সূচনা ৯৯
ফারহান হুসাইন আলিফ/সাজ্জাদ হোসেন শান্ত ১০৮
সায়মা আঞ্জুম বিভা/ রওজানা ইসলাম ১২১
মো. জুনায়েদ/ শাহিনা আলম ১২৮



কোনো এক মা'কে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি-
খোকা তুই কবে আসবি!
কবে ছুটি?"
চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।
"মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা তাই কি হয়?
তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরবো।
লক্ষ্মী মা রাগ ক'রো না,
মাত্রতো আর কটা দিন।"
"পাগল ছেলে"
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপরে রাগ করতে পারি!"
নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কী!
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে!
ক্লান্ত খোকা!
কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝ'রে পড়েছে ডাঁটা
পুঁইলতাটা নেতানো,
"খোকা এলি?"-
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।
এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় ব'সে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে
খোকা তার
কখন আসে! কখন আসে!
এখন,
মার চোখে শিশির ভোর,
স্নেহের রোদে।
ভিটে ভরেছে।

ঢাকা বিভাগ



জাবির ইব্রাহিম

গেজেট নং: ৪০৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৫

পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শিশু জাবির ইব্রাহিম ঢাকার দক্ষিণখান থানার পশ্চিম মোল্লারটেক এলাকায় ২০১৮ সালের ১৯শে মে সোমবার জন্মগ্রহণ করে। সে কেসি মডেল স্কুল ও কলেজ-এর ইংরেজি ভার্সনের নার্সারির মেধাবী ছাত্র ছিল। শান্ত স্বভাবের জাবির নতুন নতুন খেলনার জন্য কখনো কান্নাকাটি করত না বরং বাসায় ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে হ্যান্ড ক্রাফট ও খেলনা বানাতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ছোটোবেলা থেকেই নামাজ পড়ত। আর্মি অফিসার হবার স্বপ্ন দেখত জাবির। কোটা সংস্কার আন্দোলনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর তৎকালীন সরকার বাহিনীর নিপীড়ন দেখে জাবিরের মা-বাবা সিদ্ধান্ত নেন ৫ই আগস্ট লং মার্চে যাবে। দুপুরে জানতে পারে সরকার পদত্যাগ করেছে। এ সংবাদে সারা দেশে বিজয় মিছিল বের হয়। জাবিরের আবদারে পরিবারের সবাই মিলে বিজয় মিছিলে যায়। উত্তরা পূর্ব থানার কাছে মিছিলটি পৌছলে হঠাৎ পুলিশ গুলি করা শুরু করে। সবাই ছুটতে থাকে এদিক-সেদিক। এক সময় জাবির আহত হয়ে বাবার হাত থেকে পড়ে যায়। দ্রুত কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানে জাবির শাহাদত বরণ করে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে।

জাবিরের বাবা কবির হোসেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং মা রোকেয়া বেগম গৃহিণী। পরিবারের ৪ সদস্য নিয়ে জাবিররা পশ্চিম মোল্লারটেকে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একটি ফ্লাটে বসবাস করেন। জাবিরের বড়ো বোন জুমাইনা কবির নেহা এইচএসসি উত্তীর্ণ এবং বড়ো ভাই জুহাবের মাহতাব আবদুল্লাহ কে সি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৫ম শ্রেণির ছাত্র। স্থায়ী ঠিকানা: তুলাই সিমুল, মনিয়ন্দ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।



মো. গোলাম নাফিজ

গেজেট নং: ৭৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭

ঢাকা জেলার উত্তরখান থানার দোবাদিয়া ইউনিয়নের ২৪৬/এ/২ এলাকায় শহিদ মো. গোলাম নাফিজ ২০০৮ সালের ২২ শে মে জন্মগ্রহণ করে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র গোলাম নাফিজ রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। দুই ভাইয়ের মধ্যে নাফিজ ছিল ছোটো। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ সকাল ১১ টার সময় বাবার কাছ থেকে বাংলাদেশের পতাকা কেনার জন্য ৩০ টাকা নিয়ে মহাখালীর বাসা থেকে পায়ে হেঁটে ফার্মগেট এলাকায় তার বন্ধুদের সাথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সেখানে আন্দোলন দমাতে পুলিশ আক্রমণ করে। আক্রমণে আহতদের চিকিৎসা দিতে হাসপাতালে নেওয়ার ক্ষেত্রে গোলাম নাফিজ কাজ করছিল। বিকাল ৩টায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় ঢলে পরে নাফিজ। এ সময় একজন পুলিশ রিকশা ডেকে নাফিজকে তুলে দেয়। তখন সে রিকশার রডটি শক্ত করে ধরে রাখে। নাফিজের এ ছবি পরে পত্রিকায় ছাপা হলে মা-বাবা জানতে পারে তাদের সন্তান শহিদ হয়েছে।

নাফিজের বাবা মো. গোলাম রহমান পেশায় ব্যবসায়ী এবং মা নাজমা আক্তার গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: বাসা নং ১১৩১/১, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬। বড়ো ভাই গোলাম রাসেল বি এ এফ শাহিন কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছে।



শাহরিয়ার খান আনাস

গেজেট নং: ৭৯২

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১২

বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে আনাস ছিল সবার বড়ো। ১৪ই অক্টোবর ২০০৭ সালে শাহরিয়ার খান আনাসের জন্ম। গেন্ডারিয়া আদর্শ একাডেমির বিজ্ঞান বিভাগের ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ৫ই আগস্ট সকাল ৯টায় গেন্ডারিয়ার বাসা থেকে গোপনে বেরিয়ে চানখারপুলে আন্দোলনে যোগ দেয় আনাস। বের হওয়ার সময় তার স্কুলের খাতায় মা-বাবার উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে আসে। চিঠিতে সে লিখে, 'আমি যদি বেঁচে না ফিরি, তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনে প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই'। শাহরিয়ার খান আনাস তার ছোট্ট জীবনে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা তার জীবন এবং দেশের ইতিহাসের গতিপথকে চিরতরে বদলে দেয়। আনাস কিছুটা সহজ-সরল প্রকৃতির ছিল। তার মায়ের কথা অনুযায়ী রাস্তাঘাটও তার খুব একটা জানা ছিল না। তাই সে আন্দোলনে যাওয়ার আগেই তার প্রাইভেট টিউটর (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী) ভাইয়ের কাছে থেকে রোডম্যাপ জেনে রাখে। বেলা ১১টায় আন্দোলনরত অবস্থায় আনাসের বুকে গুলি লাগে। বুকে হাত দিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর তার লেখা চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের পাঁচজন উল্লেখযোগ্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদের মধ্যে আনাসের নাম উল্লেখ করা আছে।

আনাসের বাবা শাহরিয়ার খান পলাশ ব্যবসায়ী, মা সানজিদা খান দীপ্তি গৃহিণী। তার ছোটো দুই ভাই- পাঁচ বছর বয়সি সাফওয়ান ও দুই বছর বয়সি সুফিয়ান। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: ৮৮/১ দীনোনাথসেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।



মো. নাঈম

গেজেট নং: ৫৩৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৯

একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল মো. নাঈম। বড়ো হয়ে উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখত। নাঈম মা-বাবার আদরের ছোটো সন্তান ছিল। জন্ম ১৩ই জানুয়ারি, ২০০৭। গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলার রানাপাশা গ্রামে। তবে তার জন্ম ঢাকায় এবং বেড়ে ওঠা নারায়ণগঞ্জ জেলায়। প্রতিদিন আন্দোলন থেকে ফিরে পতাকাটি জানালার গ্রিলে বেঁধে রাখত নাঈম। দিনের প্রস্তুতি নিতে রাতে নিজের রুমে প্ল্যাকার্ড ডিজাইন করত। সে বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের স্নেহ করত। নিয়মিত মসজিদে যাওয়া আসা করত।

২০২৪-এর দুর্বার আন্দোলনে প্রথম থেকেই যোগ দেয় শহিদ মো. নাঈম। বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলে 'স্পেশাল ওয়াটার সাপোর্ট ইউনিট এন্ড রিমেডি ইউনিট'। দু-দলে ভাগ হয়ে যায় তারা। যার কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হয় নাঈম। আন্দোলনকে সামনের দিকে নিতে তার নেতৃত্বে যাত্রাবাড়িতে আরও ছোটো ছোটো ইউনিট গঠিত হয়। ১৯শে জুলাই ২০২৪, শুক্রবার আনুমানিক বিকেল ৪.১৫ মিনিটে যাত্রাবাড়ি থানার কাছে শহিদ হয় নাঈম। বাসায় না ফেরার কারণে মা-বাবা ছেলেকে খুঁজতে বের হন। যাত্রাবাড়ির প্রতিটি অলিগলিতে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যান বাসায়। বিনিদ্র রাত কাটে তাদের। ২০শে জুলাই নাঈমের বাবা ছদ্মবেশে লুঙ্গি পরে ঢাকা মেডিকেলের প্রতিটি ওয়ার্ডে খুঁজেন ছেলেকে। অবশেষে নাঈমের দেখা পান মর্গে। যখন নাঈম আকাশের তারা হয়ে গেছে।

বাবা মো. কামরুল ইসলাম ও মা মাহমুদা পারভীন দুই ছেলেকে নিয়ে অনেক আশা করতেন। যে কারণে বাবা চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তারা আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। সন্তানদেরকে নিয়ে যাত্রাবাড়ির কুতুবখালী এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। নাঈমের বড়ো ভাই মো. নোমান, শিক্ষার্থী।



মেহেদী হাসান

গেজেট নং: ৫৮৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ২৪

বাল্যকাল থেকে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী মেহেদী হাসান ২০০৭ সালের ১৪ই জুলাই জন্মগ্রহণ করে। বাবা মেহের আলী, মা পারভীন বেগমের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো মানুষ বানাবেন। কিন্তু আর্থিক দুর্বলতার কারণে স্কুল ছাড়তে হয় মেহেদীর। মাত্র তৃতীয় শ্রেণিতে এসে থেমে যায় তার স্কুল জীবন। নয় বছর বয়সে একটি মেরামত কারখানায় কাজ শুরু করে সে। মেহেদী সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলত। নামাজের সময় হলে মসজিদে যেতে দেরি করত না। কারখানার সবাই মেহেদীকে অনেক পছন্দ করত। লাজুক মেহেদী কখনও অন্যায় কাজে সাপোর্ট করত না। খুব শান্ত স্বভাবের এবং ভালো ছেলে ছিল।

মেহেদী পরিবারের বাধা না মেনে পর পর দুইদিন আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯শে জুলাই ২০২৪, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তখন উত্তাল দেশ। সারা দেশে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। সেদিন ছাত্র-জনতাকে পানি খাওয়ানোর কথা বলে অনেকটা পরিবারের অমতে আন্দোলনে যায় মেহেদী। সেদিনই শাহাদত বরণ করে মেহেদী।

ঢাকার যাত্রাবাড়ি দক্ষিণ কুতুবখালি বড়ো মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় পরিবারের সাথে বসবাস করত মেহেদী। তার বাবা একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। মা-বাবা, দুই ভাই ও এক বোন নিয়ে পরিবার তাদের।



মো. আহম্মেদ আব্দুল্লাহ

গেজেট নং: ৫৫১

আইডি: ঢাকা বিভাগ ২৮

আহম্মেদ আব্দুল্লাহ ১৩ই অক্টোবর ২০১০ সালে জন্মগ্রহণ করে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার দারুল উলুম পাথরঘাটা মাদ্রাসায় কিতাব বিভাগে পঞ্চম শ্রেণিতে লেখাপড়া করত আব্দুল্লাহ। বর্তমানে যাত্রাবাড়ি থানার গোবিন্দপুর এলাকার হক টাওয়ারে ভাড়া বাসায় বসবাস তাদের। আব্দুল্লাহ অনেক মেধাবী এবং শান্তশিষ্ট ছিল। যে-কোনো কাজ খুব দ্রুত করতে পারত। মাদ্রাসার একাডেমিক কাজ শেষ করে বাসায় ফেরা ছিল শহিদ আহম্মেদ আব্দুল্লাহর নিয়মমাফিক রুটিন। কখনও বাবা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতেন আবার কখনও একাই বাসায় ফিরত। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা থেকে রাত ৯:৩০মিনিটে বাসায় ফেরার পথে যাত্রাবাড়ির কাজলা এলাকায় সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। সেখানে পুলিশ উপর্যুপরি গ্রেনেড ও গুলি ছুড়ে। রাত ৯টায় তিনটি গুলি লাগে আব্দুল্লাহর শরীরে, পরে যায় মাঝ রাস্তায়। তার শরীরের ওপর দিয়ে পুলিশ সাজোয়াযান চালিয়ে দেয়। আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে ফিরিয়ে দিলে ঢাকা মেডিকেল নেওয়া হয়, ততক্ষণে আব্দুল্লাহ শাহাদত বরণ করে।

বাবা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মা আমেনা বেগম গৃহিণী। আহম্মেদের ছোটো ভাই: আজিজুল হক অনাস, মাদ্রাসাতুল আবরার এর প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আর রয়েছে একমাত্র বোন মারিয়াম। স্থায়ী ঠিকানা- দৌলতপুর, রসুলপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।



তাসনিম জাহান রাদিয়া, চতুর্থ শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর



আরিয়ান ইসলাম সোহান, ষষ্ঠ শ্রেণি, আলী আহমদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গোড়ান, ঢাকা



মো. মাহমুদুল হাসান জয়

গেজেট নং: ১৪৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ২৯

বাংলাদেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করতে শহিদ হয়েছে কতশত মানুষ। মো. মাহমুদুল হাসান জয় সেই শত শহিদের একজন। ২০০৯ সালের ২১শে নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কুলিয়ার চর থানার ফরিদপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। জয় বড়ো হয়েছে নানির কাছে। লেখাপড়া করেছে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। নানির কাছে বড়ো হওয়া মাহমুদুল মায়ের দুঃখ লাঘবের জন্য একটি সেনেটারি দোকানে কাজ করত। মাহমুদুল খুব ভালো ছাত্র ছিল। ভালো ছাত্র হওয়ায় সবাই তাকে ভালোবাসত এবং সে সকলের প্রিয় ছিল। লেখাপড়া না করলেও রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন ছিল। মিশুক স্বভাবের জয় খেলাধুলা পছন্দ করত। ৫ই আগস্ট ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার কর্মসূচি 'লং মার্চ টু ঢাকা। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ার চর থেকেও আসে লং মার্চমুখী মিছিল। আর এই মিছিলেই বন্ধুদের সাথে ঢাকায় আসে মাহমুদুল হাসান জয়। সেখানেই পুলিশের গুলিতে জয় আহত হয় দুপুর ১টায়, পরবর্তীতে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মো. মাহমুদুল হাসান জয় শাহাদত বরণ করে রাত ৩টায়।

বাবা মো. মিজানুর রহমান নাহিদ পেশায় একজন সিএনজি চালক। মা হাসি বেগম পেশায় গার্মেন্টস কর্মী। তার একমাত্র বোন মাহমুদা আক্তার চম্পা।



মো. ইয়ামিন চৌধুরী

গেজেট নং: ৬৭০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৩০

প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান মো. ইয়ামিন চৌধুরী। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে দরিদ্র পরিবারে ইয়ামিন জন্মগ্রহণ করে ২০০৭ সালের ১৩ই আগস্ট। অভাবের কারণে ইয়ামিন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। ইয়ামিন রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করত। সেই সুবাদে সে কারখানার পাশে উত্তর বাড্ডা হাসান উদ্দিন সড়কে থাকত। ২০২৪ এর ১৯শে জুলাই বিকাল ৪ টার দিকে সে কারখানা থেকে বাসায় ফিরছিল। ওই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজপথ ছিল মিছিলে উত্তপ্ত। পথে উত্তর বাড্ডা সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে এলে সন্ত্রাসীদের একটি গুলি তার নাভির নিচে বাম দিকে বিদ্ধ হয়, আর অন্য আরেকটি গুলি ডান হাতে লেগে আহত হয় ইয়ামিন। পথচারিরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইয়ামিন ভর্তি করালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭শে জুলাই ভোর ৫ টায় শাহাদত বরণ করে।

শহিদ ইয়ামিনের বাবা মো. রতন চৌধুরী ও মা ইয়াসমিন পেশায় পোশাক কারখানার শ্রমিক। একটি ভাড়া বাসায় মা-বাবা ও ভাইয়ের সাথে থেকে ইয়ামিন বেড়ে উঠেছে।



মো. ইব্রাহিম খলিল

গেজেট নং: ৭০১

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৩১

ঢাকা ডেমরা থানার মাতুয়াইল এলাকায় জন্মগ্রহণ করে মো. ইব্রাহিম খলিল ২০১২ সালের মে মাসের ১ তারিখে। শৈশবটা খুব বেশি সুখের ছিল না ইব্রাহিমের। যখন তার বয়স মাত্র ছয় মাস, সে সময় তার ৬ বছর বয়সি বড়ো ভাই ও মাকে ফেলে বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ইব্রাহিম ও তার বড়ো ভাই দুজনে মাদ্রাসায় পড়ত। বড়ো ভাই হিফজ শেষ করে। পরবর্তীতে পারিবারিক টানাপোড়েনে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বড়ো ভাইয়ের। এদিকে শহিদ ইব্রাহিম ডেমরার জামিয়া মাদানিয়া বাইতুস সুজুদ মাদ্রাসায় কুরানের হিফজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে কোরানের প্রায় ৬ পারা হেফজ সম্পন্ন হয়েছিল তার। ছোটো থেকেই খুব শান্ত স্বভাবের এবং খুব ভালো মনের একজন মানুষ ছিল ইব্রাহিম। সে সব সময় সবার উপকার করত। একই সাথে সে প্রচণ্ড মেধাবী ও ধার্মিক ছিল। তাকে নিয়ে পরিবারের স্বপ্ন ছিল যে, একদিন সে বড়ো আলেম হবে। ২০২৪ সালের ১৯শে জুলাই, সেদিন সকাল থেকেই সাইনবোর্ড এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। জুম্মার সালাত আদায় করে একবার বাসায় যায় ইব্রাহিম, এরপর চলে যায় আন্দোলনে অংশ নিতে। সেখানেই আনুমানিক বিকেল ৪ টায় ইব্রাহিম আহত হয় ও পরে শাহাদত বরণ করে।

তার বাবার নাম মো. হানিফ। মা ছখিনা বিবি অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করত। ইব্রাহিম ডেমরা থানা হাজী বাদশা মিয়া রোডের একটি বাসায় মা ও বড়ো ভাইয়ের সাথে ভাড়া থাকত। স্থায়ী ঠিকানা: বরাব বাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।



লিটন হাসান

গেজেট নং: ৭৯০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৩৩

ঢাকার মিরপুরে এক দরিদ্র পরিবারে ২০১২ সালের ২রা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে লিটন হাসান লালু। আদর করে তাকে লালু বলেই ডাকত সবাই। পারিবারিক ও আর্থিক অনটনের কারণে পড়ালেখাটা বেশিদূর করতে পারেনি লালু। খুব অল্প বয়সেই সে পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে পেরেছিল। তাই মিরপুরে একটা ফুলের দোকানে চাকরি নেয়। লালু সারা দেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে মিরপুর-১০ এর ফলপট্টি মোড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ৪ঠা আগস্ট সকাল ১১ টার দিকে বাসা থেকে বের হয়। আহত হয় দুপুর ১:৩০ মিনিটে। শাহাদত বরণ করে ৭ই আগস্ট ২০২৪, সকাল ৯:৫০ মিনিটে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল ঢাকায়। যে বয়সে লেখাপড়া, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে আনন্দ করে সময় কাটানোর কথা, সে বয়সেই লালু তার বাবা আর ভাইদের সাথে পরিবারের হাল ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর সাত মাস দুই দিন।

লালু পিতা মো. হাফিজ ও মাতা মোসা. আসমা দম্পতির ছয় সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বড়ো ভাই মো. মিলন এবং মেজো ভাই মো. নয়ন দুজনেই ফুটপাতের ভ্যানে ব্যাবসা করেন। সেজো ভাই মো. রতন এখনও বেকার আছেন। একমাত্র বোন মোসা. রত্না ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। লালুর আরেক বড়ো ভাই মো. হৃদয়। বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: সেকশন-১২, ব্লক-ডি, লেন-১১, বাসা- ৫৩, মিরপুর, ঢাকা।



শাহরিয়ার হাসান আলভি

গেজেট নং: ৬৮৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৩৪

মাতা-পিতার একমাত্র ছেলে সন্তান শাহরিয়ার হাসান আলভীর জন্ম ২০০৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। শাহাদত বরণের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। ছোটোবেলা থেকেই সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ঢাকা মিরপুরের কালশীর দেশ পলিটেকনিক স্কুল এন্ড কলেজে নবম শ্রেণিতে আলভী পড়াশোনা করত। সে পড়াশোনায় যেমন মনোযোগী ছিল তেমনি সামাজিক কাজকর্মেও নিজেকে নিয়োজিত রাখত। সহপাঠীদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করত।

দিনটি ছিল ৪ঠা আগস্ট ২০২৪। শহিদ শাহরিয়ার হাসান আলভী সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মাকে বলে, 'মা, আমি একটু আসছি'। এরপর দুপুরে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার বেরিয়ে যায়। মা তাকে বার বার বলে, 'বাবা তুমি যেও না, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না'। কিন্তু এরপর আলভী আর ফিরে আসেনি। ছাত্র-জনতার ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য মিছিলের সাথে আলভি মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে যায়। সেখানে গুলি লেগে আহত হয় আলভী। আহত আলভীকে ডা. আজমল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই শাহাদত বরণ করে ছোট্ট আলভী। ছেলের শখের কম্পিউটার, বইখাতা সব পড়ে আছে, নেই কেবল ছেলেটা।

বাবা মো. আব্দুল হাসান একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মা মোসা. সালমা খাতুন একজন গৃহিণী, যিনি ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করেন। তার ছোটো একটি বোনও রয়েছে, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার ১১নং বহরবুনিয়ার পশ্চিম বহরবুনিয়ায়।



আরিফ

গেজেট নং: ১৯২

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৪০

ভোলা জেলার লালমোহন থানার অন্তর্ভুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের সাং চাঁদপুর ৯নং ওয়ার্ডে মো. আরিফ ২০০৭ সালের ২৩শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে। ঢাকায় থাকত বিরবাগিচা মহল্লা, ৪নং রোড, যাত্রাবাড়িতে। বড়ো তিন বোনকে বিয়ে দিয়ে বয়সের ভারে বাবা নুয়ে পড়লে পরিবারটির হাল ধরেন শহিদ আরিফ। এরপর গ্রাম ছেড়ে চলে আসে ঢাকায়। শুরু করে তার নিজের মামাত ভাইয়ের ভাতের দোকানে কর্মচারীর কাজ, অন্যদিকে চলছিল পড়াশোনাও। শহিদ আরিফের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দোকান মালিক মামাত ভাই শাহাবুদ্দিন বলেন, 'নিয়মিত নামাজ আদায় করত আরিফ। আমার অবর্তমানে আমার দোকান চালাতো সে'। জীবনের প্রতিটি ধাপে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া আরিফ তখনও ছিল ভোলা জেলার লালমোহন থানার একটি স্থানীয় সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

ছাত্র আন্দোলনের ডাক আসলে প্রতিদিনের মতো ১৯শে জুলাই আন্দোলনে চলে যায় আরিফ। বিকাল আনুমানিক তিনটায় যাত্রাবাড়ি এলাকায় ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় আরিফ। মিছিলে গুলির আঘাতে শাহাদত বরণ করে আরিফ। বাবা ইউসুফ কৃষক ও মা ফরিদা গৃহিণী। অসুস্থ বাবার পাশাপাশি ছোটো দুই বোনের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সারথি ছিল শহিদ আরিফ নিজেই।



মো. ইমন

গেজেট নং: ৫৭৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৪৪

ভোলা জেলার সন্তান মো. ইমন। পেশাগত কারণে ছিল রিকশাওয়ালা। ঢাকায় পিতা-পুত্র মিলে সংসারের হাল ধরেন। জুলাই মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে বিপ্লবের মাস। ২০শে জুলাই ছিল থমথমে অবস্থা। ঢাকাসহ সারা দেশ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। এদিন ছাত্র - জনতা জীবনের মায়া ত্যাগ করেই আন্দোলন চালিয়ে যায়। রুজির তাগাদায় ইমন রিকশা নিয়ে বাড্ডার তেতুল তলায় আসে। অতর্কিতভাবে মিছিলে আক্রমণ করে পুলিশ গুলি করে। একটি গুলি ইমনের মাথার বাম পাশে লাগে। সাথে সাথে রাস্তায় পড়ে যায় সে। সেখানেই ৩:৩০ মিনিটে শাহাদত বরণ করে ইমন। তার ভাই রাজিবের মতে, 'ইমন খুব ভালো মানুষ ছিল। কারও সাথে কোনো রকম বাকবিতণ্ডায় জড়াত না। মা-বাবার কথামতো চলত। আমার ভাই কাজের মানুষ। আমরা গরিব মানুষ'।

তার পিতার নাম মো. সালাউদ্দিন নান্টু, মা কুলসুম বেগম। ইমনের জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১০। তারা তিন ভাই ও এক বোন। স্থায়ী ঠিকানা: সাচিয়া গ্রাম, ৪নং ওয়ার্ড, থানা- ভোলা সদর, জেলা- ভোলা। তার বর্তমান বাসা ২৯৫, স্বাধীনতা স্মরণী, জামতলা রোড, বাড্ডা, ঢাকা।

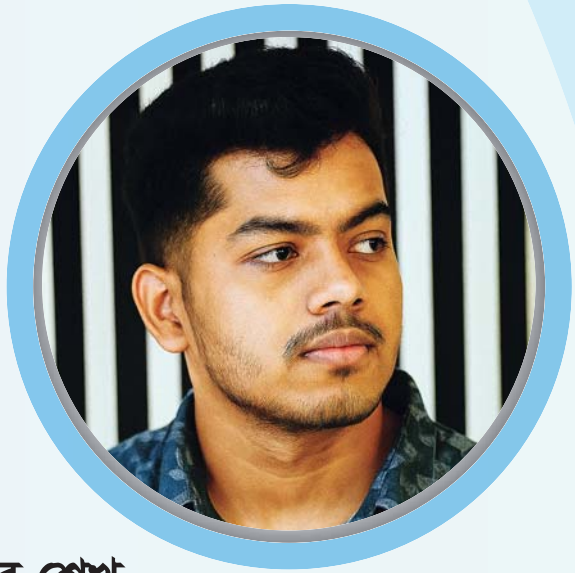

জিল্লুর শেখ

গেজেট নং: ৫৩৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৫৪

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কাঠি বাজার ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামে ২০০৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জিল্লুর শেখের জন্ম। পরিবারের বড়ো সন্তান সে। প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল জিল্লুর। সন্তানের সফলতায় মুগ্ধ হয়ে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসেন মা-বাবা। বাড্ডার আফতাবনগরে পরিবারের সাথেই থাকত জিল্লুর শেখ। ২০২৪ সালে বনশ্রীর ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৪.৯৬ পেয়ে এসএসসি পাস করে। আফতাবনগরের ইম্পেরিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল শহিদ জিল্লুর। সে ছোটো বয়স থেকে নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছিল। সব সময় ছোটোদেরকে স্নেহ এবং বড়োদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলত। নামাজের সময় হলে মসজিদে যেতে দেরি করত না ছেলেটি এবং অন্যায় কাজে কখনও কাউকে সমর্থন করত না।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই বন্ধুদের সাথে রামপুরা এলাকা থেকে নিয়মিত আন্দোলনে যোগ দেয় জিল্লুর। বাসায় বললে মা রাগ করবে, এজন্য কাউকে না জানিয়ে নিয়মিত রাজপথে যাতায়াত ছিল তার। ১৮ই জুলাই ২০২৪ দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে জিল্লুর তার মা'কে বলে- 'মা নামাজ পড়তে যাই।' নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে আফতাবনগরের দিকে যাত্রা করে। এরপর বন্ধুদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। মিছিল নিয়ে বের হয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দিকে। সেখানেই গুলিতে জিল্লুর আহত হয়ে আদাবর নাগরিক হাসপাতালে যাওয়ার পথেই দুপুর ২ টায় শাহাদত বরণ করে।

জিল্লুর শেখের বাবা মো. হাসান শেখ ও মোছা. শাহনাজ বেগম দম্পতির প্রথম সন্তান। বাবার পেশা ব্যাবসা, মা গৃহিণী। চার ভাইবোনের মধ্যে জিল্লুর সবার বড়ো। তার মেজো ভাই দশম শ্রেণিতে ও ছোটো ভাই তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। ছোটো বোনের বয়স মাত্র দুই বছর।



মো. নুর হোসেন পিয়াস

গেজেট নং: ৫৬০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৬১

২০০৬ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে জন্মগ্রহণ করে পিয়াস। সে গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করে। ৫ই আগস্ট নুর হোসেন পিয়াস নোয়াখালী থেকে ঢাকায় আসে কাজের সন্ধানে। ইচ্ছা ছিল ঢাকায় ফুফুর বাসায় থেকে কাজ খুঁজবে।

তখন চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। কারফিউ জারি আর মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্নতার কারণে তখন বাসা থেকে বের হওয়া কিংবা কারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ৫ই আগস্ট সরকারের পতন হয়। সেদিন ঢাকায় ফুফুর বাসা থেকে বিজয় উল্লাসে বের হয় নুর হোসেন পিয়াস। তখন গুলি ছুড়ে পুলিশ। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পিয়াসের মাথায় একটি গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করে পিয়াস। গ্রামের সবার সাথে মিলেমিশে চলত পিয়াস। খেলাধুলাও পছন্দ করত। তার ইচ্ছা ছিল একদিন অর্থ উপার্জন করে সংসারের অভাব দূর করবে।

পিয়াসের বাবা মো. বাবর মিয়া একজন রাজমিস্ত্রি। মা ফাতেমা বেগম গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন: নোয়ান্নই, পো: বাঁধেরহাট, জেলা: নোয়াখালী। পিয়াসের আছে আরও চার ভাই এক বোন।



হারানো সকাল

আবীর মাহমুদ

সকালবেলার রোদে
হাঁটত নিয়ে ব্যাগ কাঁধে
মায়ের চোখে ভবিষ্যৎ
ঝলমল করত আহ্লাদে।

জানত না সে এই দেশটা
থামাবে তাকে গুলির শব্দে
খেলার মাঠের হাসি
মিশে গেল অশ্রুর ছন্দে।

ছোট্ট হাতে আঁকতে ছিল
দেশের মানচিত্র
সেই হাত থেমেছে রক্তে
দেখেছে জুলাইয়ের ভয়াবহ চিত্র।

অষ্টম শ্রেণি, ইস্পাহানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ,
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

রং পেনসিলের স্বপ্ন

মো. ইসমাঈল হোসেন

ছোট্ট হাতের রং পেনসিল
থেমে গেছে মাঝপথে
আঁকা হচ্ছিল এক সূর্য
বাংলাদেশের আকাশপটে।

হঠাৎ গুলি, হঠাৎ আগুন
ভয়ে নীরব ঘর
শিশু হৃদয় কেঁপে উঠে
জুলাই আন্দোলনের ঝড়।

তার স্বপ্নগুলো জ্বলছে
শোকের আকাশ ভেলায়
এক সময়ে মেতে উঠত তারা
হই-হুল্লোড় আর খেলায়।

একাদশ শ্রেণি, মুরারি চাঁদ (এমসি) কলেজ,
টিলাগড়, সিলেট



আবদুল মোতালেব

গেজেট নং: ৬৫৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৬৬

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল আবদুল মোতালেব। ২০১০ সালের ৭ই ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বড়ো নেওয়াজপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মোতালেব। ৬৩/এ, হাজারীবাগ, ঢাকায় ভাড়া বাসায় পরিবারের সাথে থাকত সে। বাবা তার ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে নিয়ে আসে। ছোটোবেলা থেকেই প্রখর মেধা, বিনয়ী এবং ভদ্র স্বভাবের ছিল আবদুল মোতালেব। বড়োদের সাথে দেখা হলে সালাম দিতো এবং শ্রদ্ধা জানাতো।

আবদুল মোতালেব বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ অন্যান্য দিনের মতোই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ধানমন্ডি জিগাতলায় বন্ধু ও বড়ো ভাইদের সাথে বিকেল পাঁচটায় মিছিলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় মোতালেব। সেখানে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার ভয়াবহ এক সংঘর্ষের শিকার হয়ে গুলিতে শাহাদত বরণ করে শহিদ আবদুল মোতালেব।

বাবা মো. আবদুল মতিন পেশায় দিনমজুর এবং মা জাহানারা বেগম গৃহিণী। তার ছোটো ভাই আব্দুল্লাহ আল মুনতাসীর এবং বিবাহিত বড়ো বোন আছে। মা-বাবার স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে তাদের ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা করে পরিবার এবং দেশের সেবা করবে।



ইমন মিয়া

গেজেট নং: ৩৫৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৬৮

মেধাবী শিক্ষার্থী ইমন মিয়া ৩রা ফ্রেব্রুয়ারি ২০১১ সালে জন্মগ্রহণ করে। ইমন দারুন নাজাত ইসলামিয়া মাদ্রাসার ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। মাদ্রাসার সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইমন ছিল অনন্য, অন্যদের থেকে আলাদা। সে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করত। শৈশব থেকেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির প্রতি খুবই সচেতন ছিল ইমন। সে বড়োদের দেখলে সালাম দিত এবং সকলকে সম্মান করত। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় সে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। সকলের সাথে ইমন হাসিখুশি ও ভদ্রভাবে কথা বলত। তাকে ঘিরে পিতার যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণের সূচনা হয়েছিল মাত্র। পিতামাতার স্বপ্নের পথেই হাঁটছিল ইমন। তবে বেশিদূর এগুতে পারল না। ১৯শে জুলাই ২০২৪ তারিখটি ছিল শুক্রবার। জুম্মার আজান হলে ইমন উৎফুল্ল মনে মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। নামাজ শেষে মোহাম্মদপুরস্থ রায়েরবাজার এলাকাসংলগ্ন কবরস্থান মসজিদের সামনে থেকেই ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে ইমন ও তার বন্ধুরাও যোগ দেয়। আনুমানিক বিকাল ৩.৩০ মিনিটে আহত হয়ে ইমন ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি হয়। এরপর সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শাহাদত বরণ করে।

ইমনের বাবা কাঞ্চন মিয়া পেশায় ভ্যান চালক। মা জহুরা খাতুন একজন গৃহিণী। ইমনের বড়ো ভাই মুহাম্মদ জিহাদ হোসেন লেগুনার হেলপার। বড়ো বোন স্বর্ণা আক্তার বিবাহিতা এবং ছোটো বোন সুবর্ণা আক্তার বর্ণা ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী। শহিদ ইমনের বর্তমান ঠিকানা: ৩২/১১, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- মধ্যঅষ্টগ্রাম, সোনাইদিঘী পশ্চিমপাড়া, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। শহিদ ইমনের পরিবার ২৫ বছর আগে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন।



মো. শাফিক উদ্দিন আহমেদ (আহনাফ)

গেজেট নং: ৭৮

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭০

বিএএফ শাহীন কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল মো. শাফিক উদ্দিন আহমেদ। মিরপুরের মধ্য পাইকপাড়ায় ১৩ই অক্টোবর ২০০৭ সালে জন্ম হয় আহনাফের। ২০২৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তার। চার সদস্যের নিম্নমধ্যবিত্ত একক পরিবারের বড়ো ছেলে আহনাফ। আহনাফ যেমন ছিল দুষ্টু, তেমনি ছিল মেধাবী ও স্বাধীনচেতা কিশোর। আর আট-দশজনের মতো বাঁধাধরা নিয়মে চাকরি করতে চাইত না সে। নিজেই কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। আহনাফের অনেকগুলো গুণের মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারার সাহস। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪, রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বরে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা সমবেত হয়। দুপুরের খাবারের পর তিনটার দিকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আহনাফ। পৌনে ৫টার দিকে পরিবারের সাথে তার ফোনে কথা হয়। তখনও সুস্থ ছিল আহনাফ। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিওতে দেখা যায় আহনাফ আহত। পরে জানা যায় আহনাফ শাহাদত বরণ করেছে। আজও স্কুলের সহপাঠীরা সবাই তার জন্য একটা ডেস্ক খালি রেখেছে, তাতে রয়েছে একটা ফুলের বুকেট। সাদা কাগজে কালো কালিতে লেখা শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ! আহনাফ তার ডাক নাম।

আহনাফের বাবা নাসির উদ্দিন আহমেদ একজন বিক্রয় প্রতিনিধি আর মা পারভীন একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে কর্মরত। তারা থাকত মিরপুর-২, মধ্য পাইকপাড়ায়। পৈতৃক নিবাস শহীদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ। তার একমাত্র ভাই ইফতেখার আহমেদ ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।



মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ

গেজেট নং: ২৮৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭১

কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ ২০০৭ সালের ১৩ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করে। নিজ গ্রামের বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার খিলগাঁও মোহাম্মাদিয়া হাফিজুল উলুম মাদ্রাসা থেকে পবিত্র কোরান হেফজ সম্পন্ন করে। এরপর পার্শ্ববর্তী আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। ৫ই আগস্ট ২০২৪ সারা দেশের জনগণ গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। সাধারণ জনতা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে শাহবাগে মিলিত হয়। পরবর্তীতে এক সাথে গণভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এরপর সারাদেশে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিকালে বাসা থেকে বের হয় জুবায়ের। মিছিল সামনের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলে জুবায়ের আহত হলে ছাত্র-জনতা তাকে মুগদা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটের সময় শাহাদত বরণ করে জুবায়ের। যে মাসে জন্ম তার সে মাসেই মৃত্যু। তফাৎ শুধু সনের।

জুবায়েরের বাবা মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। মা মলিনা বেগম গৃহিণী। তার একটি ছোটো ভাই রয়েছে নাম জুনায়েদ আহমাদ। সেও পবিত্র কোরানের হাফেজ। জুবায়ের স্ব-পরিবারের সাথে খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ানে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করত। স্থায়ী ঠিকানা: লাহিনীপাড়া, চাপড়া, পো. মোহিনীমিল, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।



রাকিব হোসেন

গেজেট নং: ২৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭৬

মাত্র ১২ বছরের হাস্যোজ্জ্বল কিশোর রাকিব হোসেন। তার জন্ম ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ ২০১২ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার ৪নং ঈসাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ নারায়ণপুর গ্রামে। মোহাম্মদপুর আই টি জেট স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র ছিল রাকিব। মা-বাবার তৃতীয় সন্তান সে। ফুটবল খেলার দক্ষতা এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তাকে তার বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। ছোটোবেলা থেকেই সে মেধাবী, বিনয়ী এবং ভদ্র আচরণের জন্য সুপরিচিত ছিল।

১৯শে জুলাই ছিল অন্য সব দিনের মতোই। রাকিব আনুমানিক বিকেল ৪:৩০টার দিকে খেলার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। তার গন্তব্য ছিল মোহাম্মদপুর ক্লাবের পাশে কাজী নজরুল ইসলাম রোড, যেখানে প্রতিদিনের মতো ফুটবল খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল তার জীবনের শেষ দিন। হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয় সে। পথচারীরা দ্রুত তাকে সিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে রাত ৯টায় শাহাদত বরণ করে রাকিব হোসেন।

রাকিবের বাবা মো. আবুল খায়ের একমাত্র উপার্জনকারী। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। মা পারভীন আক্তার গৃহিণী।



মো. ইয়াসির সরকার

গেজেট নং: ২৫৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭৭

মাতাপিতার অতি স্নেহের সন্তান ছিল মো. ইয়াসির সরকার। ইয়াসির ২০০৬ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকার ৪৯/৭ যাত্রাবাড়ি দনিয়ার শনির আখড়ায় নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে। শহিদ ইয়াসিরের পরিবার স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করে। ইয়াছির নারায়ণগঞ্জের সরকারি কলেজে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করত। ইয়াসির তার বাবা-মাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করত। ছোটো বোনকে মাদ্রাসায় আনা-নেওয়াও করত। পরিবারের বিভিন্ন কাজ সে খুবই আন্তরিকতার সাথে করত। তার বড়ো দুই ভাই পেশাজীবী হওয়ার কারণে তাকেই বেশি সময় দিতে হয়েছে পরিবারে। ইয়াসির ছিল পরিবারের মধ্যমণি। ৫ই আগস্ট ইয়াসির সকাল দশটার সময় শনির আখড়ার বাসা থেকে বের হয়ে যায়। তার মা তাকে আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেন। তবুও কিছুটা বুঝিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে রাজপথে। শামিল হয় মজলুম ছাত্র-জনতার কাতারে। সারাদিন আন্দোলন শেষে বেলা তিনটার দিকে বিজয় মিছিল নিয়ে গণভবনে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। এরপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও ইয়াসির বাসায় ফিরেনি। খোঁজ না পেয়ে তাই সবাই তাকে খুঁজতে বের হন। তার বড়ো বোন হাফসা বুশরা ফেসবুকে সন্ধান চেয়ে ভাইয়ের ছবিসহ একটি স্ট্যাটাস দেন। কয়েকজন তার ফোনে কিছু ছবি পাঠান। রাত দশটার দিকে ঢাকা মেডিকেল থেকে একজন তার ইনবক্সে একটি ছবি পাঠান এবং জানতে চান এটি তার ভাই কি না? হাফসা ছবিটি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সবাই কান্নার শব্দ শুনে জানতে চায়, কী হয়েছে? তখন পরিবারের সবাই জানতে পারে ইয়াসির শহিদ হয়েছে।

বাবা মো. ইউসুফ সরকার কাপড়ের ব্যবসায়ী এবং তার একটি টেইলার্সের ব্যাবসা আছে। মা বিলকিস গৃহিণী। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ইয়াসির চতুর্থ। শহিদ ইয়াসিরের বড়ো ভাই সফটওয়্যার কোম্পানিতে এবং মেজো ভাই একটি বেসরকারি মাদ্রাসায় চাকরি করেন। বড়ো বোন হাফসা বুশরা শিক্ষার্থী। ছোটো বোন নুসাইবা মাদ্রাসার ছাত্রী।

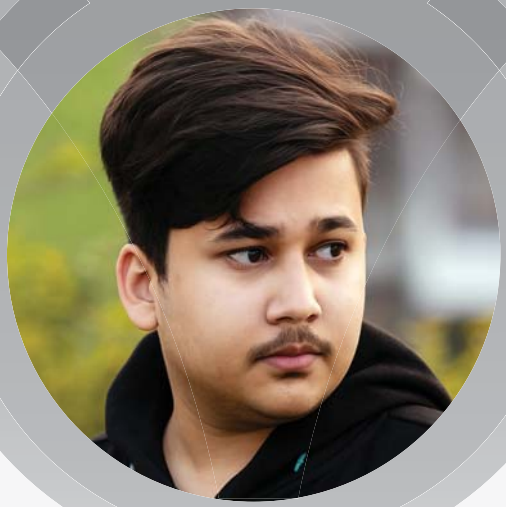

নাসিব হাসান রিয়ান

গেজেট নং: ৬০৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৯৪

ঢাকার স্থানীয় এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান নাসিব হাসান রিয়ান ২০০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করে। তার স্বপ্ন ছিল দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বড়ো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে এবং দেশের সুনাম অর্জন করবে। রাজধানীর স্বনামধন্য কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কলেজ (বিসিআইসি)-এর একাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্র ছিল শহিদ রিয়ান। এর আগে ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি পাস করে। তার সুন্দর ব্যবহার দিয়ে সে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। লেখাপড়াতে সে খুব ভালো ছিল। ক্রিকেট খেলা ছিল তার খুব প্রিয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই সে নিজেকে ইসলামের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে এবং ঝড়বৃষ্টিতেও নামাজের শুরুতে মসজিদে যেত এবং নামাজের পরে পড়তে বসত। রিয়ান নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী ছিল, একই সাথে সাহসী এবং স্নেহশীল ছিল। ৫ই আগস্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতনের খবর পেয়ে ছাত্র-জনতার সাথে নাসিব হাসান রিয়ান বিজয় মিছিল সহকারে শ্যামলীর খিলজি রোড হয়ে রিং রোডে ঢুকছিল। সেখানেই সাহসিকতার সাথে পুলিশের সামনে আবু সাঈদ ভাই এর মতো বুক পেতে দেয় রিয়ান এবং শাহাদত বরণ করে। তিন ভাইয়ের মধ্য রিয়ান ছিল সবার মধ্যমনি।

রিয়ানের বাবা মো. গোলাম রাজ্জাক কৃষি মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। তিনি রাজধানীর শ্যামলীতে নিজস্ব ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে বাস করেন। নাসিবের বড়ো ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোটো ভাই ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে।

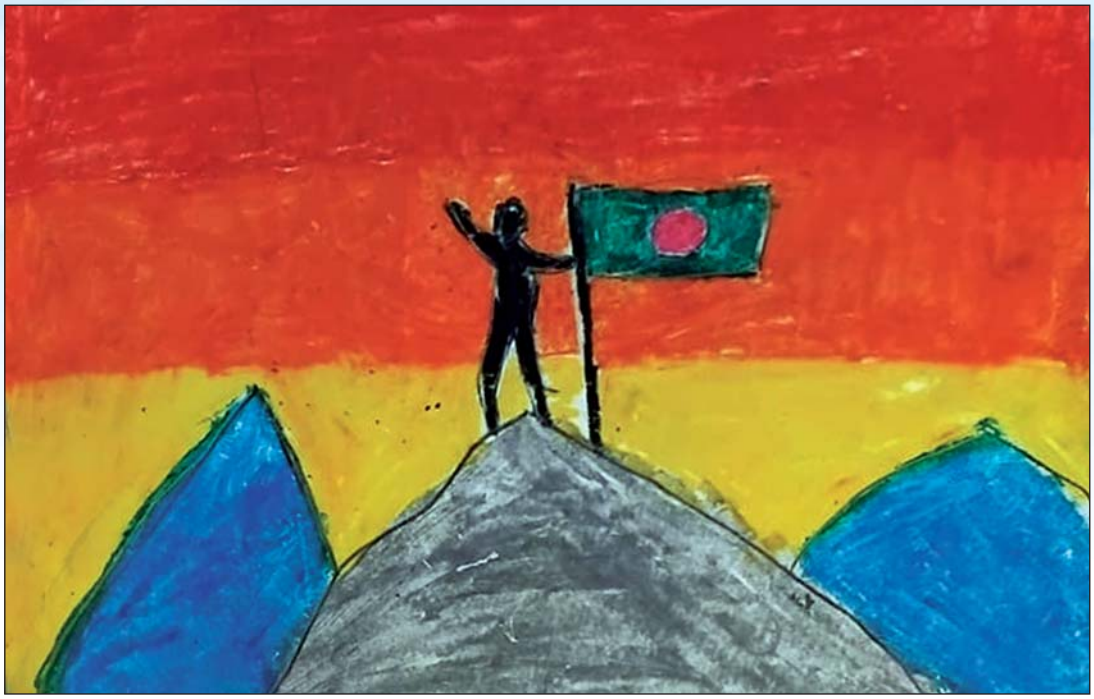

নাফিসা তাসনিম স্নেহা, তৃতীয় শ্রেণি, বারহাট্টা মডেল স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

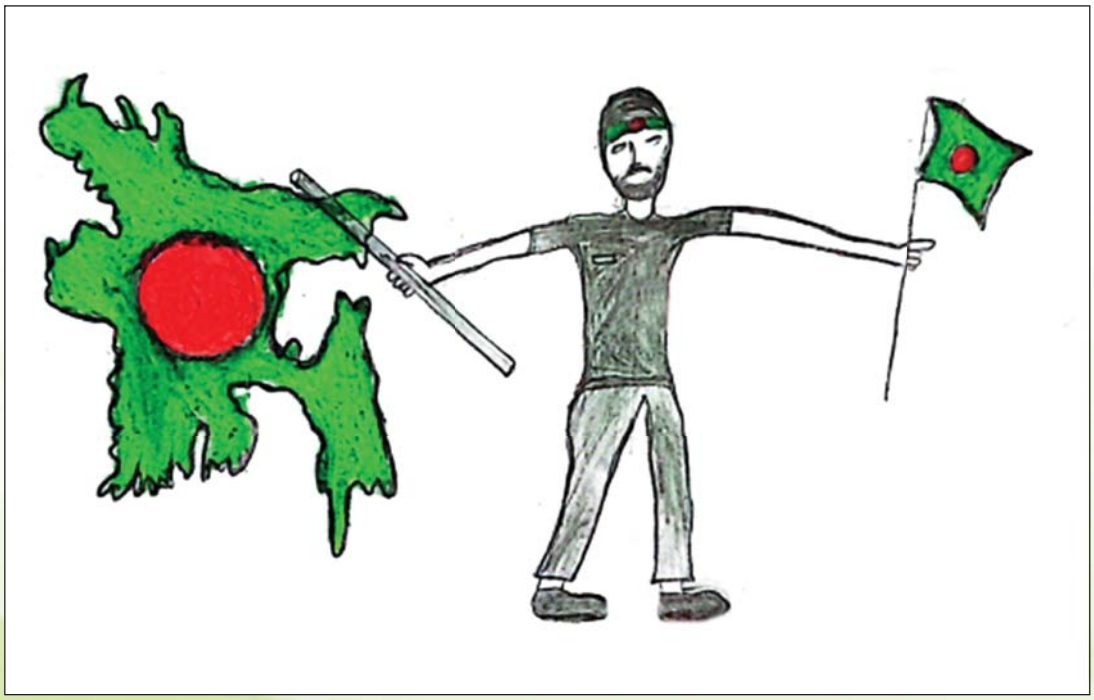

আশরাফি তাহসিন, দ্বিতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

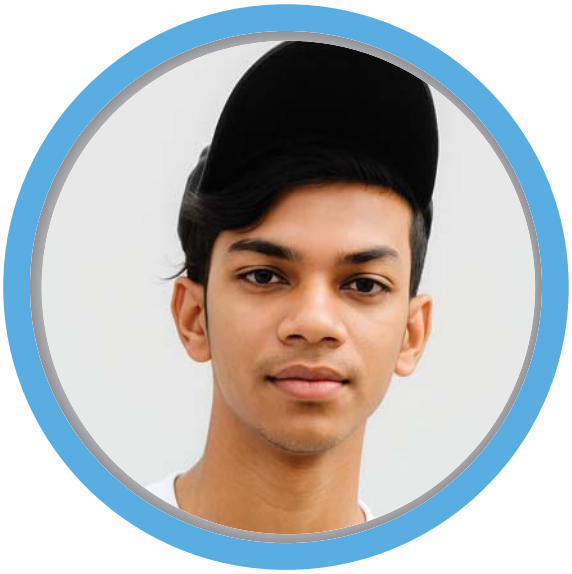

মমিন ইসলাম

গেজেট নং: ০৭৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৯৯

ভোলা জেলার চরকলমি (চরফ্যাশন) ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভক্তির হাট মাদ্রাসা গ্রামে মমিন ইসলাম ২০০৭ সালের ২১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মেধাবী তরুণ মমিন ইসলাম এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়েছিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ঢাকা কমার্স কলেজে। স্বপ্ন ছিল পরিবারকে দারিদ্র্যমুক্ত করার। ৫ই আগস্ট স্বৈরাচার থেকে মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত বিজয় চলাকালেই মুমিন ইসলাম শাহাদত বরণ করে।

জীবিকার তাগিদে মমিনের বাবা মো. বাবুল ঢাকায় এসে ভাড়া বাসায় ওঠেন এবং ট্রাক-ড্রাইভারের পেশায় নিযুক্ত হন। মা মোমেনা বেগম একজন গৃহিণী। মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান এবং দুই বোনের অতি ভালোবাসার ভাই ছিল শহিদ মমিন। সকল স্বপ্ন, বৃদ্ধ দাদা-দাদি, মা-বাবা আর অতি আদরের দুই বোনকে রেখে মমিন ইসলাম পরপারে পাড়ি জমায় ঘাতকের বুলেট ধারণ করে। মমিনের স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: ভক্তির হাট মাদ্রাসা; ইউনিয়ন: চরকলমি ৪নং ওয়ার্ড; থানা: দক্ষিণ আইচা; জেলা: ভোলা। বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি-২৩৯, ইস্টার্ন হাউজিং মেইন রোড; থানা: রুপনগর, মিরপুর ১২; ঢাকা।



নাজিবা তাহসিন, শ্রেণি মঞ্জুরী, নালন্দা কিন্ডার গার্টেন, ঢাকা

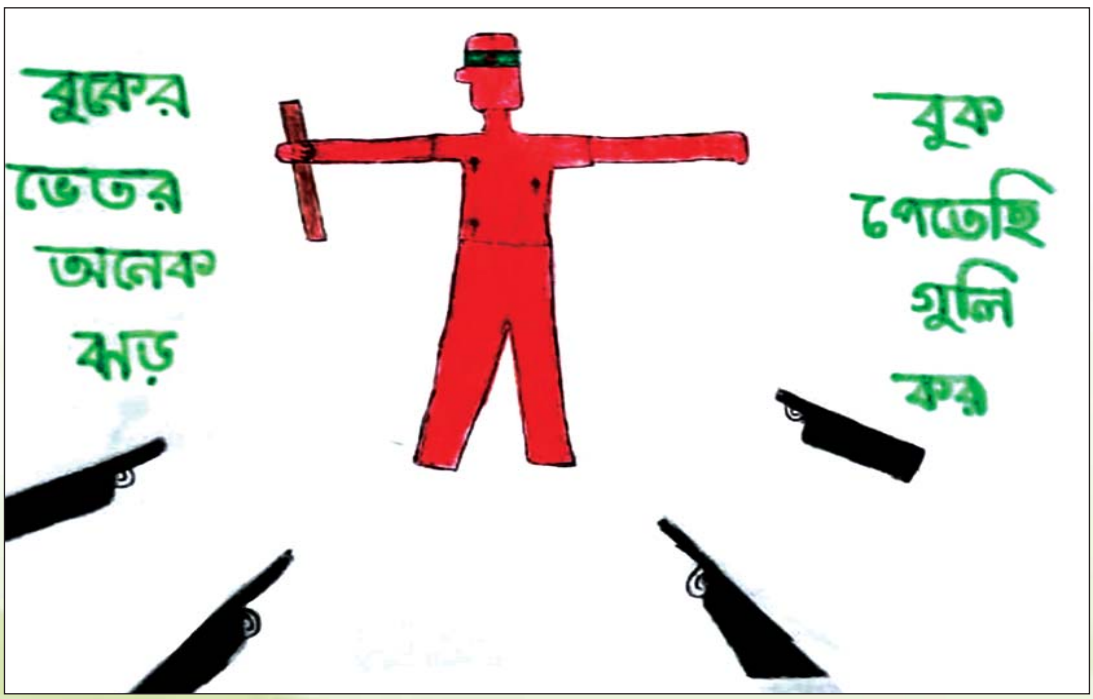

শারিকা তাসনিম, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজীগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর



মো. রুস্তম

গেজেট নং: ৭৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৮

মো. রুস্তম জুলাই আন্দোলনের এক অমর বীর। ২০০৯ সালে রুস্তম নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। সবুজ ঘাসের গালিচা আর মেঠোপথের মাটির গন্ধে মিশেছিল তার শৈশব। সেই রুস্তমের জীবনের গল্প আজ ইতিহাসের পাতায় লেখা। সরলতা, চঞ্চল আর সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখের রুস্তম গ্রামবাংলার সেই চিরায়ত ছেলেটি। রুস্তম রাজধানীর মিরপুরের ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। রুস্তম প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত প্রতীক। ২০২৪ সালের ১৯শে জুলাই, ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর রোড বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল রুস্তমের। তরুণদের সঙ্গে রুস্তমও সেদিন স্লোগানে মুখরিত করেছিল চারপাশ। এরপর পুলিশের গুলিতে রুস্তমের হাসি থেমে গেল চিরতরে। আর তার স্বপ্নগুলো মিশে গেল শহরের উত্তপ্ত বাতাসে।

রুস্তমের বাবা মো. মাইন উদ্দীন টেইলারিং দোকানের একজন কর্মচারী। মা সোফিয়া বেগম গার্মেন্টসে চাকরি করেন। রুস্তমের আরো এক ভাই ও এক বোন রয়েছে। অর্থের টানাপোড়েনের মাঝেও বাবা ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার স্বপ্ন দেখতেন।

গ্রামের সবুজ প্রান্তর থেকে শহরের কোলাহলে এসে রুস্তম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিল। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার হৃদয়ে ছিল এক অগ্নিশিখা। পরিবারের অভাব-অনটন আর প্রতিদিনের সংগ্রামের মাঝেও রুস্তমের চোখে ছিল পরিবর্তনের স্বপ্ন। কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না। রুস্তমের মা-বাবা তাকে বারবার বাধা দিয়েছিলেন। মা গার্মেন্টসের কাজ শেষে ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বাবা, তুই এসবের মধ্যে যাস না। তোর তো পড়াশোনা আছে। তোর জন্য আমাদের কত স্বপ্ন'। বাবা মাইন উদ্দিন কড়া গলায় বলেছিলেন, 'পরিবারের অবস্থাটা তো দেখছিস! আন্দোলন করে কী হবে?' কিন্তু রুস্তম থেমে থাকেনি। তার হৃদয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। অশ্রুতে ভেজা পরিবারের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে সেদিন সে চলে গিয়েছিল আন্দোলনের মিছিলে। আন্দোলনে ১৯শে জুলাই মিরপুর ১০-এ রুস্তম শাহাদত বরণ করে।



মো. সাদ মাহমুদ খান

গেজেট নং: ১২০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ২৩

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা খান পাড়া গ্রামে ২০১২ সালের ৬ই আগস্ট সাদ মাহমুদ খান জন্মগ্রহণ করে। পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান ছিল সাদ। সাদের যখন জন্ম, তখন প্রবাসে ছিলেন তার পিতা। মমতাময়ী মায়ের আঁচল তলেই কেটেছে তার মধুর দিনগুলো। ছোটো থেকেই একমাত্র ছেলেকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে দেখতে চেয়েছে তার পরিবার। তাই খেলাধুলা যতই থাকুক, আজান কানে পৌঁছানো মাত্র মসজিদে যেতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করত না সাদ। তার হাতেখড়ি হয় মাদ্রাসাতেই। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মারকাযুল উলুম আশরাফিয়াতে কোরানের ২ পারা হিফজ শেষ করে সাদ। তবে সাদ চাইছিল হিফজের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলোতেও সমান পারদর্শী হতে। ছোটো থেকেই ক্রীড়াপ্রেমী ছিল কিশোর সাদ। পড়াশোনার মাঝে অল্প কিছু সময় পেলেই ফুটবল নিয়ে মাঠে চলে যেত সে। ভালো খেলোয়াড় হওয়ার কারণে তার বন্ধুরা যথেষ্ট সমাদরে রাখত তাকে। আর প্রতি শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া থেকে আটকানো যেত না সাদকে। সাভার থেকে কখনো কখনো নিজেই চলে যেত মানিকগঞ্জের নিজ গ্রামে। জুলাই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০শে জুলাই তৃতীয় দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন ছিল। এরই প্রতিবাদে পরদিন ২১শে জুলাই, আন্দোলনকারীরা সাভার থানাধীন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সাভার নিউ মার্কেটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কোনার রাস্তায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল। তাদের ভাড়া বাড়িটির ছাদ থেকে সবটুকুই প্রত্যক্ষ করছিল সাদ ও তার বড়ো বোন। একসময় চুপিচুপি ছাদ থেকে নেমে আসার সময় সাদের ১০ বছর বয়সি খালাতো ভাই হাসিব দেখে ফেলে। সে কই যাচ্ছে জানতে চাইলে সাদ মাহমুদ বলে, 'আন্দোলনে যাচ্ছি, বাসায় বলিস না যেন'। বিকাল ৫টার কিছুক্ষণ পর সাদ মাহমুদসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। ৫:৪০ মিনিটে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে সাদকে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে শাহাদত বরণ করে সে।

তার পিতা বাহাদুর খান প্রবাসী ও মাতা মোছা. হালিমা আক্তার গৃহিণী। বড়ো বোন তাসলিমা ও ছোটো বোন আফরোজা খানম নুসরাত দুজনই জাবাল-ই নূর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: ধল্লা খানপাড়া; ইউনিয়ন: ধল্লা; উপজেলা: সিংগাইর; জেলা: মানিকগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা- মহল্লা: জি১২/১, ব্যাংক কলোনী; উপজেলা: সাভার; জেলা: ঢাকা।



মো. আদিল

গেজেট নং: ৪৪৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ২৬

ঢাকার মীরহাজিরবাগে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় দশম শ্রেণিতে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করত মো. আদিল। মেধাবী ছাত্র আদিল ২০০৮ সালের জুন মাসের ১০ তারিখে পরিবারের তৃতীয় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। নম্র-ভদ্র ব্যবহারের কারণে শিক্ষক, গুরুজন আর সহপাঠীরা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। আদিল বাস করত নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার অন্তর্গত কুতুবপুর ইউনিয়নের ভুইঘর গ্রামে পরিবারের সাথে। মো. আদিল প্রথমে বাড়িতে থেকেই মাদ্রাসায় যাতায়াত করত। এরপর জুলাইয়ের শুরুতেই মাদ্রাসার হোস্টেলে ভর্তি হয় আদিল। কেননা সামনে ছিল তার দাখিল পরীক্ষা। ঘটনার দিন ছিল ১৯শে জুলাই ২০২৪। সারা দেশে চলছে কারফিউ, অন্যদিকে ছাত্রদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি। এমতাবস্থায় ওইদিন বিকাল ৩:৩০ মিনিটে আদিল নারায়ণগঞ্জের ভুইঘর এলাকার এসবি গার্মেন্টসের সামনে অন্যান্য ছাত্র-জনতার সাথে সমবেত হয়। এরপর স্বৈরাচার সরকারের নির্মম-নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করে আদিল।

আদিলের বাবা ব্যবসায়ী মো. আবুল কালাম ও মা আয়েশা আক্তার গৃহিণী। তার বড়ো দুই ভাই আব্দুল্লাহ আল নোমান মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন এবং বায়েজিদ আহমদ পড়ছেন পলিটেকনিকে। পরিবারের ছোটো ছেলে হওয়ায় মা-বাবার পরম আদরের ছিল মো. আদিল। সে ছিল দুই ভাইয়ের চোখের মণি।



রাহাত হোসেন শরীফ

গেজেট নং: ২২৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৩৬

রাহাত গাজীপুর জেলার গোপালপুর গ্রামে ২০০৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করে। মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিল সে। রাহাত ছিল একজন সচেতন তরুণ। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দূষণমুক্ত দেশ ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখত। তাই সে 'বিডি ক্লিনে' স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেয়। নম্রতা, ভদ্রতা ও অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। নিয়মিত লাইব্রেরিতেও যাতায়াত ছিল। তার পছন্দের তালিকায় ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলো ছিল বেশি। ২০২৪ সালের ১৪ই জুলাই উত্তরার আজমপুরে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র ৪ দিনের মাথায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদত বরণ করে রাহাত।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, প্রাইভেট-পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৮ই জুলাই ঢাকার সবগুলো পয়েন্টে ছাত্রদের সাথে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের সদস্যদের সংঘাত হয়। সেদিন রাজধানীর উত্তরা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। হেলিকপ্টার ও উঁচু ভবনের উপর থেকে হামলায় রাহাত আহত হয়ে অনেকক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকে। হাসপাতালে নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সবাই দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে রাহাতকে উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগীর চাপের কারণে ডাক্তার আসতে দেরি হয়। অবশেষে হাসপাতালে সন্ধ্যা ৭টার দিকে শাহাদত বরণ করে রাহাত। রাহাতের বাবা মো. সেলিম সৌদি আরবে থাকেন। মা স্বপ্না গার্মেন্টসে চাকরি করেন। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: বাহের চর; পো: চশবুদ্ধি; উপজেলা: রায়পুরা; জেলা: নরসিংদী। বর্তমান ঠিকানা: গোপালপুর, ওয়ার্ড ৪৪, টঙ্গী, গাজীপুর।



মো. সামিউল আমান নূর

গেজেট নং: ২৪০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৫৪

গাজীপুর জেলার পূর্ব আচিনপুর গ্রামে মো. সামিউল আমান নূর ২০১০ সালের ১২ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করে। মো. সামিউল আমান নূর সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি সামিউল ইংরেজিতে কবিতা লিখত এবং ক্রিকেট খেলায়ও পারদর্শী ছিল। সকলের কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিল সামিউ।

ছাত্ররাই অজেয়- এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশ সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১লা জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ই জুলাই থেকে সহিংস হয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেধাবী অকুতোভয় বীর সৈনিক সামিউল আমান নূর। ৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ জনতার সাথে যোগ দেয় সামিউল। বিকাল ৫টার সময় উত্তরার বিএনএস ফ্লাইওভার এলাকায় বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে সে। বিজয় মিছিলে জয়োল্লাসে মেতে ওঠা নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হঠাৎ আক্রমণ শুরু হয়। মুহূর্তেই রাজপথ রূপ নেয় রণক্ষেত্রে। বিজয়ের আনন্দ হয়ে যায় শোকাচ্ছন্ন। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সামিউল আমান নূর। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থল থেকে সুকৌশলে তাকে উদ্ধার করে উত্তরা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শাহাদত বরণ করে সে।

তার বাবা মো. আমান উল্লাহ প্রবাসী এবং মা শাহানুরা আমান গৃহিণী। তার দুজন বোন আছে। স্থায়ী ঠিকানা- তুলাতলী, সহদেবপুর, তুলাই, ফতেপুর, কচুয়া, চাঁদপুর।



ফয়জুল ইসলাম রাজন

গেজেট নং: ৬৯৮

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৫৯

ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নে উত্তর বাহেরচর এলাকায় ২০০৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করে ফয়জুল ইসলাম রাজন। মিরপুরের ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত সে। দোকানে কাজ করে যোগাড় করত নিজের লেখাপড়ার খরচ।

শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও তা ক্রমেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯শে জুলাই ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টায় মিরপুর-১০ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে আন্দোলনরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন বাহিনী।

তাদের ছোড়া গুলিতে ফয়জুল ইসলাম রাজন আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজনকে মিরপুর-৬ এলাকার ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিমিটেডে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজনের বাবা নুরে আলম ও মা মোছা. মাহমুদা। বাবা নিরুদ্দেশ থাকায় ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নের উত্তর বাহেরচর এলাকায় রাজনের মায়ের সংসারে রাজন ও তার দুই সহোদর লালিত-পালিত হয়েছে। বড়ো বোন বিবাহিত। ছোটো ছেলের শাহাদত বরণের কিছুদিন আগে চাকরি হারিয়েছেন রাজনের বড়ো ভাই। তাদের স্থায়ী ঠিকানা: পাচানি শিকদারবাড়ি, পাচানি, নারায়ণপুর, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।



রিয়া গোপ

গেজেট নং: ১৪৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৬৮

সদা চটপটে, হাস্যোজ্জ্বল রিয়া গোপ ২৪শে নভেম্বর ২০১৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। শহিদ হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৬ বছর ৬ মাস। সে নারায়ণগঞ্জের ৩২নং নয়ামাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। রিয়ার হাতের লেখা খুবই সুন্দর এবং সে পড়াশোনায় খুবই আগ্রহী ছিল। ভ্রমণপ্রিয় শিশু রিয়া খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হই-হুল্লোড় করত। সে যেমন ছিল ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী তেমনি স্কুলের পড়ালেখায়ও ছিল মেধাবী, বুদ্ধিমান ও চৌকস। রিয়ার ছিল বই পড়ার নেশা। বাবার পুরাতন এন্ড্রয়েড মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কিছু জানা আর শেখার চেষ্টা ছিল তার। বড়োদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে খুব পছন্দ করত। রিয়া ছিল বাবার আদুরে। সুযোগ পেলেই বাইরে ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরত।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১লা জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ই জুলাই থেকে সহিংস হয়। ২০২৪ সালের ১৯শে জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক দুঃখজনক দিন। দেশের ছাত্র-জনতা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিল। সেই সময় রিয়া তার বাসার ছাদে খেলছিল। এসময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটি গুলি রিয়ার মাথায় লাগে। তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ২৪শে জুলাই ২০২৪, সকাল ১০টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদত বরণ করে রিয়া। রিয়ার বাবা দীপক কুমার গোপ এবং মা বিউটি ঘোষ। স্থায়ী ঠিকানা: নয়ামাটি, ডিআইডি, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।



রোকাইয়া সুলতানা রাহিকা, পঞ্চম শ্রেণি, মেধা কিন্ডারগার্টেন, নাটোর



তাহমিদ ভূঁইয়া

গেজেট নং: ৬৮৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৯৭

তাহমিদ ভূঁইয়া ৮ই মে ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে নরসিংদী জেলায়। তার বাবা রফিকুল ইসলাম একজন পল্লি চিকিৎসক, মা তায়্যিবা বেগম গৃহিণী। ১৮ই জুলাই ২০২৪ দেশে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছিল। এক দিকে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অন্যদিকে স্বৈরশাসক ও তার পোষা প্রশাসন। এমনই এক থমথমে পরিস্থিতিতে সবার প্রিয় ছোট্ট তাহমিদ দুপুরে গোসল সেরে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে জোহরের নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। মসজিদ থেকে নামাজ শেষে বাসায় ফিরে আসে। এরপর প্রতিদিনের মতো পরিবারের সবার সাথে দুপুরের খাবার শেষ করে।

যতই পরিবারের সাথে সময় কাটাক তাহমিদের মন কিন্তু পড়েছিল আন্দোলনের মাঠে। তাই তো প্রতিদিনের থেকে একটু তাড়াহুড়ো করে খাবার শেষ করে। খাবার শেষে তাহমিদ পরিবারের কাউকে না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য জেলখানার মোড়ে যায়। জেলখানার মোড়ে যাওয়ার পথে ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশের রোষানলে পড়ে। পুলিশ তাহমিদকে লক্ষ্য করে অটবি ফার্নিচারের বিল্ডিং-এর উপর থেকে অতর্কিত গুলি চালায়। ১ বা ২টা নয়, একজন বালকের উপর অসংখ্য গুলিবর্ষণ করে। গুলির তীব্রতা বেশি হওয়ার কারণে তাহমিদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার ওপর পড়ে যায়। সাথে সাথে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। সময়টা ছিল বিকাল সাড়ে চারটা। এতটুকু ছোটো এক বালক কতগুলো গুলির ভার বহন করতে পারে?

ছাত্র-জনতা তাহমিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিতে চাইলে ফ্যাসিস্ট পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। বাধা কাটিয়ে তাহমিদকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালে চিকিৎসক তাহমিদকে মৃত ঘোষণা করে। তার স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চিনিশপুর, ইউনিয়ন: চিনিশপুর, ওয়ার্ড নং-৩, থানা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী।



আব্দুল আহাদ

গেজেট নং: ১৬৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭৬

জুলাই আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ শহিদ আব্দুল আহাদ ২০২০ সালের ১২ই জুলাই ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে। চমৎকার একটি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠতে যাচ্ছিল সে। কথা বলা শেখার সাথে সাথে আব্দুল আহাদ শিখেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। মাকে নামাজ পড়তে দেখলেই পাশে দাঁড়িয়ে যেত। সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে ইসলামি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করছিলেন আহাদের মা-বাবা। কিন্তু সে স্বপ্নের প্রদীপ নিভে গেল একটি ঝড়ো বাতাসে।

১৯শে জুলাই ২০২৪। দিনটি ছিল শুক্রবার। মা-বাবার সাথে বেলকনিতে দাঁড়িয়েছিল শিশু আহাদ। আপন মনে এটা-ওটা দিয়ে খেলছিল। এই দুনিয়ার নির্মমতা বোঝার বয়স তার হয়নি। কারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ-ক্ষোভ ছিল না তার নিষ্পাপ হৃদয়ে। বাসা থেকে অনেকটা দূরেই কোটার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে বের হয়েছিল। সেই মিছিলে স্বৈরাচার সরকার আঘাত হানে। চলতে থাকে অজস্র গুলি। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে পিছন ফিরে আহাদের মা দেখেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে আহাদ। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তাররা জানান আহাদ আর নেই।

আহাদের বাবা মো. আবুল হাসান একজন আয়কর কর্মকর্তা, মা কুহিনূর আক্তার সুমি গৃহিণী। আহাদের ভাই একটি মাদ্রাসায় হিফজ পড়ে। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পো. পুখুরিয়া, ওয়ার্ড-৮, মানিকদহ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।



তামীম শিকদার

গেজেট নং: ৬০২

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৭৭

রামপুরা প্রাইমারি স্কুলের ৩য় শ্রেণির ছাত্র তামিম শিকদার। ২০১৪ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে। থাকত ঢাকার রামপুরায়। পারিবারিক সমস্যার কারণে চার বছর বয়স থেকে দাদির কাছে লালিত-পালিত হচ্ছিল। দাদি ফুটপাতে পিঠা বিক্রি করে তামিমকে মানুষ করার চেষ্টা করছিলেন।

তামিম ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র। সমবয়সী কারো সাথে মারামারি করত না। ২৪ সালের জুন মাসে শুরু হয় এক দুর্বার আন্দোলন। ১৯শে জুলাই বেলা ৩টার সময় তামিম সহপাঠীদের নিয়ে রামপুরা এলাকায় বল খেলতে যায়। তার বাসার পাশে রাস্তায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। হঠাৎ তামিম চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়। সবাই দেখে তামিমের বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তামিমের বাবা ও দাদি দৌড়ে রিকশা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদ তামিমের বাবা মো. জুয়েল শিকদার একজন রিকশাচালক। মা তানিয়া আক্তার গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: মুনসুরাবাদ খাপুরা, সিকদারবাড়ি, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।



মো. হাসিবুর রহমান

গেজেট নং: ৬০৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৮৭

মাদারীপুর জেলার উত্তর কানাইপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে হাসিবুর রহমানের জন্ম ২০০৭ সালে। খুব ছোটোবেলায় হাসিবুর তার মাকে হারায়। তাদের একমাত্র সন্তান হাসিবুর বাবার সঙ্গেই বড়ো হয়। বাবার শয্যাশায়ী অবস্থা সাথে মা না থাকায় সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে ছোট্ট হাসিবুরের কাঁধে। অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি সে। বয়স একটু বাড়তেই সে দিনমজুরের কাজ শুরু করে। এরপর মোটর মেকানিক হিসেবে কাজ শেখা শুরু করে। মেকানিকের কাজ তাদের পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা এনে দিতে শুরু করে। হাসিবুরের জীবন ছিল কঠিন বাস্তবতার প্রতিফলন। নিজের দায়িত্ববোধ তাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে হাসিবুর। ৫ই আগস্ট 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে সাভারে ছাত্রদের সাথে যোগ দেয়। সকাল ১০ টার দিকে হঠাৎ দুটি সাধারণ গাড়ি আন্দোলরত ছাত্রদের সামনে এসে দাড়ায় এবং সরকারের গুণ্ডা বাহিনী গাড়ি থেকে বের হয়ে গুলি করা শুরু করে। তাদের ছোড়া একটি বুলেট এসে হাসিবুরের মাথায় লাগে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও আশপাশের কোনো হাসপাতাল তাকে ভর্তি নেয়নি। পরে এনাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনদিন আইসিউতে থাকার পর ৭ই আগস্ট বিকেল ৪ টায় শাহাদত বরণ করে হাসিব।

মা আলমাস মারা যাওয়ার পর বাবা দেলোয়ার হোসেন প্যারালাইজড হয়ে যান। হাসিবুরের ফুফু অসুস্থ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। হাসিবুরের বৃদ্ধ দাদি হাসিবুরের বাবা ও তার ফুফুর দেখাশোনা করেন।

হাসিবুরের স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: উত্তর কানাইপুর, ইউনিয়ন: অলীনগর, থানা: মাদারীপুর।

বর্তমান ঠিকানা: ডি-৯৩, তালবাগ, সাভার, ঢাকা।



তাওহীদ সন্নামত

গেজেট নং: ২৩৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৮৮

মাদারীপুর জেলার সুচিয়াডাঙ্গা গ্রামে তাওহিদ সন্নামত ১৪ই জুলাই ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। জীবনের শুরু থেকেই দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতা তাকে পরিবেষ্টিত করে। গ্রামের পরিবেশেই তাওহিদ বেড়ে উঠেছে। মিশুক প্রকৃতির কারণে খুব সহজে সকলের মন জয় করতে পারত। দারিদ্র্যতার কারণে অল্প বয়সেই পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে।

১৮ই জুলাই ২০২৪ সালে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে সারা দেশের মতো মাদারীপুরেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। ন্যায়ের দাবিতে উদ্দীপ্ত ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান। তাওহিদ সন্নামত একজন সাধারণ নির্মাণ শ্রমিক। ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তার বন্ধুরা এই আন্দোলনের অংশ ছিল। ১৯শে জুলাই বিকাল ৩ টার দিকে তাওহিদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। আনুমানিক বিকাল ৫টার দিকে মাদারীপুর শহরের উপকণ্ঠে খাগদি নামক স্থানে আন্দোলনের সময় তাওহিদ গুরুতর আহত হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় শাহাদত বরণ করে।

তাওহিদের বাবার নাম মো. সালাউদ্দীন সন্নামত, যিনি পেশায় দিনমজুর। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: সুচিয়ারভাঙ্গা, ইউনিয়ন: মুস্তফাপুর, থানা: মাদারীপুর, জেলা: মাদারীপুর।



বাঁধন

গেজেট নং: ৩৮৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৯০

শরিয়তপুর জেলার ডিঙ্গামানিক ইউনিয়নের দক্ষিণ মালধ গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে বাঁধন ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে। ছোটোবেলা থেকেই সে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বড়ো হয়েছে। বাঁধন স্বপ্ন দেখত একদিন বিদেশ যাবে এবং পরিবারকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করবে। পারিবারিক সমস্যার কারণে বাঁধনের মা ঢাকায় থাকতেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাঁধন ঢাকায় মায়ের কাছে থেকে মোটর মেকানিকের কাজ শিখতে শুরু করে। সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী বাঁধন ১৯শে জুলাই ২০২৪ দুপুরের দিকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বাঁধন মিছিলে সামনের দিকে অবস্থান করছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে তার ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু পরিস্থিতি হঠাৎ করে পালটে যায়। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলতে থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সময় বাঁধন গুলিবিদ্ধ হয় এবং মাটিতে পড়ে যায়। সহযোদ্ধারা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে সুস্থ করে তোলার। কিন্তু শত চেষ্টাকে ব্যার্থ প্রমাণ করে অবশেষে ২৩শে জুলাই ২০২৪, রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে বাঁধন শাহাদত বরণ করে।

বাবা রোমান হাওলাদার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার মা বিথী আক্তার একজন গৃহিণী। ছোটোবেলাতেই পারিবরিক সমস্যার কারণে বাঁধনকে নানির কাছে থাকতে হয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪। বাঁধনের আরো আছে দুই ভাই। একজনের নাম নাবিল যার বয়স ১১ বছর, মাদরাসার শিক্ষার্থী। আরেকজনের নাম আদনান, ১০ মাস বয়স। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ মালধ, ইউনিয়ন: ডিঙ্গামানিক, থানা: নড়িয়া, জেলা: শরিয়তপুর।

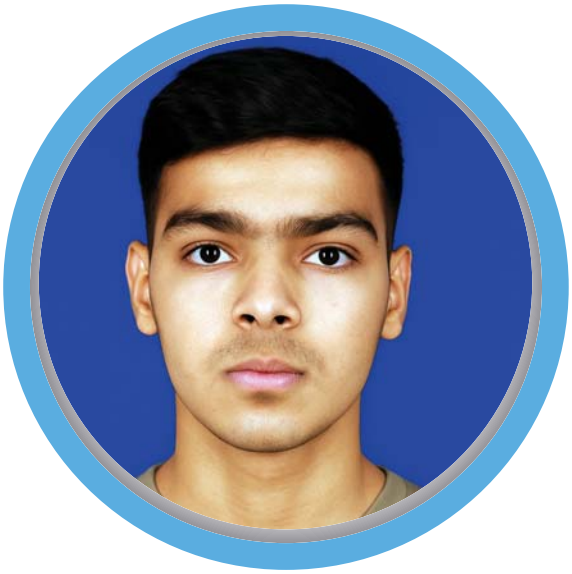

মো. সিয়াম

গেজেট নং: ৩৪০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১০১

নিজ জেলা নরসিংদীতে মো. সিয়াম ২০০৮ সালের ২৮শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। শাষপুর দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার হাফেজিয়ার ছাত্র ছিল। পবিত্র আল কোরানের ২০তম পারা শেষ করে ২১তম পারা মুখস্থ চলছিল তার। সিয়াম খুব ভালো ছেলে ছিল। সে ছোটো থেকেই নামাজ পড়ত।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে মো. সিয়াম তার বন্ধু আর সহপাঠীদের কাছে জানতে পারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কথা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন থেকে রাজপথকেই তাদের দাবি আদায়ের শেষ ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিত করে। সিয়ামও তখন থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত আন্দোলনের খোঁজ নিতে শুরু করে। ১৯শে জুলাই একদিকে কারফিউর কারণে বাসা-বাড়ি থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না আবার অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ। তাই মোটামুটি ঘরে বসে বা মহল্লায় থেকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সিয়ামের। ১৯শে জুলাই বিকেল থেকে নরসিংদী জেলার ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর আঘাত করতে থাকে। একপর্যায়ে আন্দোলনের সামনে থাকা কোরানের পাখি মেধাবী ছাত্র সিয়াম আহত হয়। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখনই আরেকটি গুলি এসে লাগে তার বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেখানেই শাহাদত বরণ করে সিয়াম।

সিয়ামের বাবা মরহুম মো. শিবলি রেজা এবং মা মরিয়ম বেগম একজন গৃহিণী। সিয়ামের একটি ছোটো বোন আছে। বাবার অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা মা নানির বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানেই বসবাস শুরু করে। শহিদ সিয়ামের মা ঋণ নিয়ে সৌদি আরবে কাজের সন্ধানে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলের শাহাদতের সংবাদে মা দেশে চলে আসে। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- শাষপুর, পো. শাষপুর, ইউনিয়ন থানা: আয়ুবপুর, উপজেলা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী।



তামিন হৃদয়

গেজেট নং: ৩৪৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১০৩

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় দক্ষিণ সাধারচর গ্রামে তামিন হৃদয় ২রা আগস্ট ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। পশ্চিমপাড়া আল আহেলিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্র ছিল তামিন। নযেরা শেষ করে হাফেজিয়া পড়ছিল। শাহাদতের সময় পর্যন্ত তার নয় পারা মুখস্ত ছিল। তরুণদের 'কোটা নয় মেধা' এই একটি দাবি হয়ে উঠেছিল জুলাই ২৪-এর গণ বিস্ফোরণ। মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক ১৯শে জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজের পর আন্দোলনে যোগ দেয়। মিছিল নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় আসলে ছাত্র-জনতার উপর অতর্কিত হামলা শুরু হয়। দিকবিদিকশূন্য হয়ে সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এমনই একটা সময়ে গুলি এসে তামিনের বুকে এবং পায়ে লাগে। সেখানেই তামিন লুটিয়ে পড়ে। মাগরিবের আজানের পর পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকে তামিন। এশার ওয়াক্ত হয়ে গেলেও যখন তামিন বাড়ি ফিরল না। পরিবারের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না তখন হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায় তামিন শহিদ হয়েছে।

তামিনের বাবা তমিজ উদ্দিন মীর ও মা রুমি বেগম। অল্প বয়সেই তার মা ইন্তেকাল করেন। মায়ের মৃত্যুর পর সে দাদির কাছেই বেড়ে ওঠে। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তামিনের বাবা কৃষিকাজ করে। মা হারা ভাইদের মধ্যে বাবা ও দাদির তামিনকে নিয়েই ছিল অনেক স্বপ্ন। শহিদ তামিনরা ছিল চার ভাই, তার মেজো ভাই রিহান মীর সৈয়দেরখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র, সেজো ভাই রিয়াদ মীর হরিন্দা মাদ্রাসায় নাযেরা পড়ছে। ছোটো ভাই সিয়াম দক্ষিণবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণির ছাত্র। ভাইদের মধ্যে তামিনই ছিল বড়ো।



মারুফ মিয়া

গেজেট নং: ৫৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১১০

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার সাবালিয়া মহল্লায় জন্মগ্রহণ করে মারুফ মিয়া। প্রবাসী বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান মারুফ। টাঙ্গাইলে নিজ বাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস করত। দশম শ্রেণির দুরন্ত কিশোর শহিদ মারুফ লেখাপড়া করত শাহিন স্কুল, টাঙ্গাইলে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই মাস জুড়ে চলা বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশের আপামর ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। এমন পরিস্থিতিতে আগস্ট মাসের ৫ তারিখে 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিকে পেশিশক্তি দ্বারা প্রতিহত করতে চাইলে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচার সরকার পদত্যাগ করে। এ উপলক্ষে সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল হয়। এমনই এক আনন্দ মিছিলে টাঙ্গাইলের সাবালিয়া মদের মোড় এলাকায় মিছিলে যোগ দেয় মারুফ মিয়া। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মদের মোড় এলাকার আয়শা খানম ক্লিনিকের সামনে পৌঁছালে মিছিলটি হামলার শিকার হয়। একটি গুলি এসে আঘাত করে কিশোর মারুফের শরীরে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারুফ। গুলিবিদ্ধ মারুফকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মারুফের বাবা মজনু মিয়া ও মা মোরশেদা বেগম। বাবা সৌদি প্রবাসী। মারুফের বোন সানজিদা।



আরাফাত মুন্সী

গেজেট নং: ৭৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১১৯

আরাফাত মুন্সী ১লা জানুয়ারি ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার বনগ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বার্ডস স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিল আরাফাত মুন্সী। গোপালগঞ্জের ছোট বনগ্রাম গ্রামে জন্ম ও বেড়ে উঠা। রিকশাচালক বাবা স্বপন মুন্সী, মা মায়া বেগম।

ভিটামাটি ও ভূমিহীন পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আরাফাত মুন্সি দেশে চলমান বেষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ই আগস্ট সকাল ১০টায় বাইপাইল মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে যায়। জড়ো হতে থাকে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দেলনের প্রথম থেকেই আরাফাত মুন্সির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। গত ৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতা, ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত কর্মসূচী প্রতিহত করার জন্য সরকার কারফিউ জারি করে। ৫ই আগস্ট বিকেলে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনা পলায়নের পর যখন সারা দেশে আনন্দ মিছিল চলছিল তখন মিছিলে অংশ নেয় শহিদ আরাফাত। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে পুলিশ আশুলিয়া থানার সামনে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সে সময় একটি গুলি আরাফাতের বুকের নিচে লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তাকে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা ৬ টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ছোট বনগ্রাম, ইউনিয়ন মহারাজ পুর, থানা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা : বাসা: বটতলা, এলাকা: পলাশবাড়ী, থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা



মো. মোবারক হোসাইন

গেজেট নং: ২০৮

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১২১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় মোলাইশ গ্রামের পশ্চিম পাড়া ৩১শে আগস্ট ২০০৮ সালে মো. মোবারক জন্মগ্রহণ করে। কিশোর মোবারক ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। মোবারক ছিল মেধাবী এবং পরিশ্রমী কিশোর। পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সাথে গরুর খামারে কাজ করত। জুলাই-এ কোটা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯শে জুলাই সকাল ১০ টায় মোবারক হোসেন বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। সেদিন সকাল থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায়। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়। এরফলে একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। অনেকে সেন্সলেস হয়ে যায়। অদম্য সাহসী কিশোর মোবারক প্রতিদিনের মতো সেদিনও খামারের দুধ নিয়ে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিল। গ্রীন রোড এলাকা দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন সে সংঘর্ষের মুখে পড়ে। এ সময় একটি গুলি এসে লাগে মোবারকের মাথায়। আহত মোবারককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় ২০শে জুলাই শাহাদত বরণ করে।

মোবারকের বাবা রমজান আলী এবং মা মোছা. ফরিদা বেগম। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। পরিবার নিয়ে রাজধানীর কলাবাগানে বসবাস করত। মোবারকের ভাই-বোন সবাই পড়াশোনা করে। বড়ো ভাই রতন ৮ম শ্রেণিতে, বোন রত্না ৭ম শ্রেণিতে, ছোটো বোন স্বপ্না ৫ম শ্রেণিতে এবং ফাতিহা ৪র্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। রমজান আলীর একার পক্ষে এত বড়ো পরিবারকে চালানো খুবই কষ্টকর। এজন্য পিতার সাথে মোবারক এবং বড়ো ভাই রতন সহযোগিতা করত।

আত্মদান

মো. আহনাফ হোসেন

যদি বেঁচে থাকত
বলত সত্যের গান
কলম দিয়ে লিখত
বিজয়ের জয়গান

অন্যায় ঠেকাতে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে
নতুন দেশ গড়তে
প্রাণ দিল বিলিয়ে

যে গান ন্যায় চায়
প্রতিটি মানব প্রাণ
নিজের জীবন দিয়ে
রেখেছে তার প্রমাণ

অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর

স্বাধীনতা

মো. মুজাহিদ

খেলনার বদলে হাতে
ছিল বইয়ের মলাট
তবু তাতে লেগে গেল
রক্তের কালো ছাট।

ভয়ানক গুলিতে নিভে গেল
আলোময় এক জীবন
তার মহান ত্যাগ
কাঁপিয়েছে মানব ভূবন।

দশম শ্রেণি, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ,
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম

স্বপ্ন

মো. নাজমুল হাসান সানি

ছোট্ট মেয়েটি বলেছিল
সে ডাক্তার হবে
রোগীদের হাসাবে
কষ্ট দূর করবে।

টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায়
হারিয়ে গেল সে
তার স্বপ্ন নিভিয়ে দিল
একটি বুলেট এসে।

পুতুলটা পড়ে আছে
ছাদের এক পাশে
বাবা মায়ের চোখে
দুঃখের স্মৃতি ভাসে।

দ্বাদশ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, মগবাজার, ঢাকা



নাফিসা হোসেন মারওয়া

গেজেট নং: ৪৯৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১২৪

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের টঙ্গী পূর্ব থানার এরশাদনগর এলাকায় নাফিসা হোসেন মারওয়া ২০০৭ সালের ৪ঠা মে জন্মগ্রহণ করে। সতেরো বছরের নাফিসা হোসেন মারওয়া ২০২৪ সালে টঙ্গির শাহাজ উদ্দিন সরকার স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে খুব মেধাবী ছিল। সারাক্ষণ বাসায় পড়াশুনা করত। কোনোদিন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। সে সবসময় পর্দার মধ্যে থাকত। কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১লা জুলাই থেকে। বীর শহিদ নাফিসা হোসেন মারওয়া গোটা ছাত্র জনতার পতাকাবাহী এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। ছাত্র জনতার ডাকে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলনে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নাফিসা রাজধানীর উত্তরায় আন্দোলনে যোগ দেয়। তার বাবা বিষয়টি জানতে পেরে তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু বিপ্লবী কন্যা নাফিসা তার বাবার বাধা উপেক্ষা করে গত ১লা আগস্ট চলে যায় ঢাকা জেলার সাভারের বক্তারপুর এলাকার মামার বাড়িতে। সেখান থেকে আবার যোগ দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। সাভারে স্কুল সহপাঠীদের নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে অংশ নেয়। ৫ই আগস্ট আন্দোলনরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা সাভার থানা স্ট্যান্ডের সামনে জমায়েত হলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। তখন হঠাৎ একটি গুলি এসে নাফিসার বুকের বা পাশে লাগে। তার সহযোদ্ধারা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পর্যবেক্ষণ করে মৃত বলে ঘোষণা করে।

তার পিতা আবুল হোসেন চায়ের দোকানদার ও মা কুলসুম বেগম প্রবাসী (কুয়েত)। পরিবারে দুই বোনের মধ্যে সে ছিল বড়ো। তার ছোটো বোন রাইসা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। নাফিসা ও তার ছোটো বোন রাইসাকে নিয়ে বাবা আবুল হোসেন টঙ্গীর এরশাদনগর বস্তি এলাকার আট নাম্বার ব্লকে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।



মোহাম্মদ রায়হান

গেজেট নং : ৫৫৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ ৯৩

মোহাম্মদ রায়হান নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। রায়হান ৬ই ডিসেম্বর ২০০৭ নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ গ্রামেই শৈশব কাটায়। রায়হান দরিদ্র পরিবারের এক সংগ্রামী যুবক। সে দারিদ্র্যতা ও প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন দেখত। সে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ঢাকা শহরে এসে গুলশান কমার্স কলেজে ভর্তি হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহিদ রায়হান তার এইচএসসি ২০২৪-এর পরীক্ষাটাই শেষ করতে পারেনি এর আগেই, তাকে হায়েনাদের আঘাতে জীবন দিতে হলো। জুলাই মাসে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলন। ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন এক দফা আন্দোলনে রূপ লাভ করে। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের আন্দোলনে ৫ তারিখের 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি দেওয়া হয়। এইচএসসি পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও রায়হান দুপুরের খাবার শেষে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার যৌক্তিক আন্দোলনে যোগ দেয় রায়হান। উত্তরা ইউনিভার্সিটির সামনে পুলিশ ছাত্রজনতাকে উদ্দেশ্য করে সম্মুখ থেকে গুলি চালায়। সেখানেই ছাত্র জনতার কাতারে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুপুর ৩ টা ৪৫ মিনিটে পুলিশের একটি গুলি তার মাথায় লাগে। শহিদ রায়হানকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে ঘটনাস্থলেই শহিদ হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রথমে রায়হান অজ্ঞাতনামা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। পরে তার পরিবারের এবং পরিচিতদের মাধ্যমে তার শনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

তার পিতা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন মাত্র সাত বছর বয়সে নোয়াখালী থেকে ঢাকায় পাড়ি জমান। তিনি একটি বাসার কেয়ার টেকার হিসেবে কাজ করেন, তার মা আমেনা খাতুন একজন গৃহিণী। জনাব মোজাম্মেল হোসেনের এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে শহিদ রায়হানই বড়ো ছেলে। ছোটো মেয়ে উর্মি আক্তার গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: দুর্গানগর, ইউনিয়ন: নোয়ান্নই, ওয়ার্ড নং-১, থানা- নোয়াখালী সদর, জেলা- নোয়াখালী।



ফারহান ফাইয়াজ রাতুল

গেজেট নং: ৪৫৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১২৫

ডাক নাম ফারহান ফাইয়াজ পুরো নাম মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়া। ফারহান ফাইয়াজের রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ২০২৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। তার বাবার নাম শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং মায়ের নাম মোসা. ফারহানা দিবা। তার জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার বরপা এলাকায়। একমাত্র বোন সায়ীমা ইসলাম, লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

ছাত্ররা কোটা প্রথার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করে দেয়। তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বার বার নস্যাৎ করে দেয় শেখ হাসিনা সরকার। ১৬ই জুলাই অন্দোলনে আবু সাঈদসহ ৬জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ১৭ই জুলাই সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে ছাত্রলীগকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। রাস্তায় কফিন মিছিল করে। ১৮ই জুলাই থেকে কলেজ-বিশ্ববিদালয়ে ছাত্রদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে অবস্থান নেয়। অনেক ছাত্রকে সাথে নিয়ে ফারহান ফাইয়াজ রাস্তায় উপস্থিত ছিল। পুলিশ শিক্ষার্থীদের উপর গুলি চালায়। সেদিন বেলা ৩ টায় জানা যায় ফারহান ফাইয়াজ বুকে ও মুখে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ছাত্ররা রিকশায় তুলে তাকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু নেওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।

তার বন্ধু বলেন, ফারহানের খুব ইচ্ছা ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাবে। আমাদের শেষ দেখা হয় গত ১৫ই জুলাই, দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার পর। একসঙ্গে গল্প করতে করতেই সেদিন বাসায় গিয়েছিলাম। ১৬ তারিখে কোটা সংস্কার আন্দোলনে আমি গিয়েছিলাম। আমার এক পোস্টে ফারহান মন্তব্যের ঘরে লিখেছিল 'প্রাউড অফ ইউ'। কে জানত, সে-ই আমাদের সবাইকে 'প্রাউড' করে চলে যাবে।



খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ

গেজেট নং: ১৯৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১২৬

ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ। খালিদ ২০০৮ সালের ২৯শে মে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে খালিদ বড়ো।

খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। টিভি চ্যানেলে সঠিক নিউজ সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে পাওয়া যেত না, দেশবাসী ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ পেত। খালিদ ১৮ই জুলাই বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে অজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে আন্দোলনে অবস্থান গ্রহণের সময় মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। খালিদ হাসান তখনো জীবিত ছিল। ছাত্ররা এক পর্যায়ে খালিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার জানান খালিদ হাসান অনেক আগেই মারা গেছে।

নিহতের লাশ শুরুতে তার পরিবারকে দেওয়া হয়নি। তার পরিবার একেকবার একেক থানায় উপস্থিত হয়ে অনেক কাকুতি- মিনতি করেও লাশ গ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়নি মর্মে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে শহিদের দেহ ফিরে পায় পরিবার।

খালিদ হাসানের বাবা কামরুল হাসান একটি মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। মা নিলুফা ইয়াসমিন গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ভদ্রাসন, উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর।



শেখ মাহাদী হাসান জুনায়েদ

গেজেট নং: ৭৪০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১১৫

শেখ মাহাদী হাসান জুনায়েদ ২০০৯ সালের ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। জুনায়েদ যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত উইল পাওয়ার স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায়। মেহেদীর বাবা জনাব শেখ জামাল উদ্দিন এবং মা সানিয়া জামাল গেন্ডারিয়া ধূপখোলা পুকুরের পূর্ব পাশে বসবাস করে। কিশোর শহিদদের তালিকায় জুনায়েদ অন্যতম। জুনায়েদের শাহাদতকে স্মরণ করতে এলাকাবাসী পুকুরের পাশে চত্বরটিকে জুনায়েদ চত্বর নাম দিয়েছে।

শেখ মাহাদী হাসান জুনায়েদ ও তার পরিবার স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫ই আগস্ট দুপুরবেলা শেখ হাসিনার দেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর সারা দেশে আনন্দ মিছিলে বের হলে মাহাদীও একটি মিছিলে যুক্ত হয়। চানখারপুল এলাকায় বুরহানউদ্দিন কলেজ গেইটের সামনের মিছিলে তাকে প্রথমে দেখা যায়। খুনি হাসিনা পালিয়ে গেলেও পুলিশ বাহিনী ওই মুহূর্তে সারা দেশে জনতার উপর গুলি চালায়। চানখারপুল এলাকার মিছিলগুলোতেও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। সেখানে অনেক ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শেখ মাহাদীও গুলিবিদ্ধ হয়। পুলিশের একটি গুলি সাথে সাথেই তার মৃত্যু ঘটায়।

মাহাদীর বাবা শেখ জামাল হাসান একটি ডেভেলপার কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বর্তমানে তিনি বেকার অবস্থায় আছেন। ঢাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে তিনি পরিবার নিয়ে বাস করেন। মেহেদীর মা সানিয়া জামাল গৃহিণী। তার বড়ো বোন নাফিসা নাওয়াল মতিঝিল আইডিয়াল কলেজে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে।



মুজাহিদ

গেজেট নং: ১২৫

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৩১

গোপালগঞ্জের গোপ্তারগাতি গ্রামে মুজাহিদ ২১শে নভেম্বর ২০০৭ সালে জন্ম নেয়। মুজাহিদ ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। ২০২৪ সালে কোটা পদ্ধতি চালু করলে দেশের ছাত্র-জনতা ক্ষেপে উঠে। বিভিন্নভাবে বঞ্চনার স্বীকার মুজাহিদ ছাত্রদের আন্দোলনে যুক্ত হয়। সরকার পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রতিহত করা হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে। ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে টিকতে না পেরে ভারতে চলে যায়। হাসিনার পদত্যাগ ও পালিয়ে যাওয়ার খবরে দেশবাসী আনন্দে রাস্তায় নেমে আসে। আবু মুজাহিদও রাজপথে ছিল। সাভার বাসস্ট্যান্ডে রাজ্জাক প্লাজার সামনে বিজয়োল্লাসরত মিছিলে পুলিশের গুলিতে আহত হয় মুজাহিদ। এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ৬ই আগস্ট মরদেহ গোপ্তারগাতি গ্রামে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবু মুজাহিদের বাবা মো. শাহাবুদ্দিন মল্লিক ঢাকার সাভারে সিঙ্গার কোম্পানির গুদামে শ্রমিকের কাজ করে। ছোটো ছেলে মোফাচ্ছের মল্লিক শ্রীপুর গ্রামে মামাবাড়িতে থাকে। মুজাহিদের মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। এক বছর আগে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- গোপ্তারগাতী; পো. খান্দারপাড়া; উপ. মুকসুদপুর; জেলা- গোপালগঞ্জ।

সিলেট বিভাগ



মো. হাসাইন মিয়া

গেজেট নং: ১

আইডি: সিলেট বিভাগ ০৮

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার যাত্রাপাশা গ্রামে মো. হাসাইন মিয়া ২০১২ সালের ১০ই জুন জন্মগ্রহণ করে। বাবার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া, ক্ষেতে কাজ করা, কাঁচা সবজি বিক্রিতে সাহায্য করা, বাড়িতে মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা, ছোটো ভাইবোনদের দেখাশুনা করা এসব কাজে কখনো কোনো অবহেলা ছিল না হাসাইন মিয়ার। তাই তো সে মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন আর পাড়া- প্রতিবেশিদের কাছে যেমন আদরের তেমনি প্রিয়পাত্র ছিল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখে হাসাইন। পুড়োটা পড়ে সে বুঝল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন নামে একটা সংগঠন তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভাইয়েরা। ৪ঠা আগস্ট হাসাইন তার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুদের কাছে জানতে পারে পরের দিন ৫ই আগস্ট এই গ্রাম থেকে অনেকেই আন্দোলনে যাবে। তাই পরের দিন বিলে মাছ ধরতে গিয়ে অন্দোলনে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায় বাবার কাছে। কিছুক্ষণ পরে হাসাইন মাছ নিয়ে বাড়িতে আসে। মায়ের হাতে মাছ বুঝিয়ে দিয়ে জামাকাপড় পড়ে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় হাসাইন। এরপর বন্ধুরা সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর ১১টায় পৌঁছে যায় নিজেদের স্কুলের সামনে। সেখানে সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ ছিল আন্দোলনে যোগ দিতে। হাসাইনের প্রিয় কয়েকজন শিক্ষকও ছিলেন। সমবেত জনতার সাথে সে রওনা দেয় সদর রোডের দিকে। দুপুর ১টায় সম্মিলিত মিছিল থানার কাছাকাছি আসলে সেখানে অতর্কিত এক হামলায় আহত এক বৃদ্ধকে পানি খাওয়াতে গিয়ে শহিদ হয় হাসাইন।

শহিদ মো. হাসাইন মিয়ার মোট ছয় ভাইবোন। বড়ো ভাই মো. জাহিদ হাসান দারুন্নাজাত মাদ্রাসায় কুরানের হিফজ (৯ পারা) পড়ছে। হাসাইন মিয়া ছিল মেজো। তার পরের ভাই মো. হোসাইন বন্যতুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। পরের ভাই মো. তামিম ইকবাল রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এর পরের ভাই মো. হামীম রায়ের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সবার ছোটো বোন জান্নাতুল ফিরদাউস এখনো অবুঝ। শহিদ হাসাইনের বাবা মো. ছানু মিয়া একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মা মোছা. সাজেদা আক্তার গৃহিণী।



নাহিদুল ইসলাম

গেজেট নং: ৬৭৬

আইডি: সিলেট বিভাগ ১১

হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লাখাই উপজেলার মুড়িয়াউক গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৭ই মে ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে নাহিদুল ইসলাম। তার লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয় এলাকার কওমি মাদ্রাসায়। নাহিদুল কওমি মাদ্রাসায় মাদানী নেসাবে পড়ত। মাদ্রাসাতেও সে ছিল সবার খুব পছন্দের। তার মেধা ও নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে সবার মন জয় করে নিয়েছিল খুব সহজেই। তার তীব্র ইচ্ছে ছিল বাবার মতো আলিমে দ্বীন হয়ে ইসলামের সুমহান মর্যাদা পৌঁছে দেবে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে। কিন্তু তার এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা অধরাই থেকে যায়। মাতা-পিতাহীন নাহিদ ছিল সবার আদরের মধ্যমণি। ৫ই আগস্ট বিকালে স্বৈরাচারী সরকার পলায়নে ছাত্র-জনতার বিজয়ের আনন্দে পুরো ঢাকা শহরে হাজারো মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। কারো হাতে ব্যানার, কারো হাতে ফেস্টুন। শহিদ নাহিদুল ইসলামও এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য ঢাকার আদাবরের রাস্তায় মিছিলে নেমে যায়। কিন্তু এ বিজয় মিছিলটি তার জীবনের শেষ মিছিলে পরিণত হয়। পুলিশের আক্রমণে শাহাদত বরণ করে নাহিদুল।

নাহিদের বাবার নাম আব্দুল আজিজ। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করতেন তিনি। মা মরহুম নাছিমা আজিজ। নাহিদের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই এতিম নাহিদের দেখাশোনা করতেন তার দাদি। বর্তমান ঠিকানা: ডি-১৭৭, হাউজিং (পল্লবী ২য় পর্ব), থানা পল্লবী, জেলা: ঢাকা। নাহিদুলের এক বোন সাদিয়া সুলতানা, সাউথ আফ্রিকায় বসবাসরত আছেন আর এক ভাই মাওলানা নাইমুল ইসলাম একজন চাকরিজীবী।

রাজশাহী বিভাগ

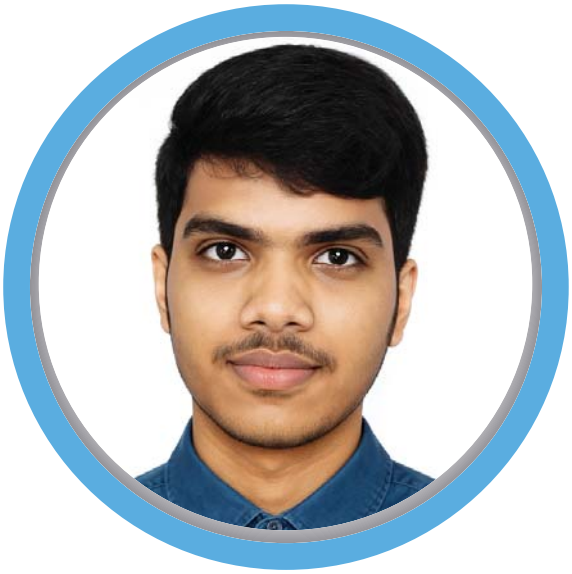

আস-সাবুর

গেজেট নং: ৪৪৪

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৫

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর থানার উকিলপাড়া গ্রামে আস সাবুরের জন্ম ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী শাহিন কলেজ, ঢাকা (আশুলিয়া শাখা)। এই প্রতিষ্ঠানে সাবুর বিজ্ঞান বিভাগে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। অত্যন্ত মেধাবী সাবুর ছাত্রজীবনে কোনো ক্লাসে দ্বিতীয় হয়নি। সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাথে পাস করত। সাবুরের মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ এখনো বাসায় সাজানো রয়েছে অনেক পুরস্কার। নিয়মিত নামাজ আদায় করত সাবুর।

৫ই আগস্ট ২০২৪, সাবুর সকাল ৯টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। সকাল পৌণে ১১টায় তার বড়ো ভাইকে ফোন দিয়ে জানায় যে, সে আন্দোলনে গিয়েছে বাইপাইল মোড়ে। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আবারও তার বড়ো ভাইকে ফোন করে জানায় সেখানে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। কিন্তু সে নিরাপদ জায়গায় আছে। পরবর্তীতে বেলা সাড়ে ৩টায় সাবুর তার বাসার এক ভাইকে নিরাপদে থাকার কথা তার মাকে জানাতে বলে। বিকেল ৫টা থেকে তার আর কোনো খোঁজ মিলছিল না। তখন থেকেই শুরু হয় সাবুরকে খোঁজ করা। এলাকার সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং আশপাশের অলি-গলি তাকে খোঁজা হয় কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে ৬ই আগস্ট বিকালে তার আগুনে পোড়া মরদেহ পাওয়া যায় আশুলিয়া থানার সামনে যা ৫ই আগস্ট বিকালে ঘটেছিল।

সাবুরের বাবা মো. এনাব নাজেজ (জাকী) অবসরপ্রাপ্ত গার্মেন্টস কর্মী ও মা মোছা. রাহেন জান্নাত ফেরদৌসি গৃহিণী। মা-বাবার দুই সন্তানের মধ্যে সাবুর ছোটো। বড়ো ভাই মোহাম্মাদ রিজওয়ানুল ইসলাম পড়াশোনা শেষ করে বগুড়ায় প্রিমিয়ার সিমেন্ট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন।



মো. তারিক হোসেন

গেজেট নং: ২০৫

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৮

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার চৌডালা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইসলামপুর গ্রামে তারিক হোসেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে ২০০৬ সালের ১লা জুন জন্মগ্রহণ করে। তারা থাকত শেরেবাংলা নগর এলাকায় উজ্জ্বলের বস্তিতে। পেশায় তারিক হোসেন ছিল কাঠমিস্ত্রি।

মাত্র ১১ বছর বয়সে তারিক কাঠমিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত হয়ে সততা, দক্ষতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তারিক হোসেন নিয়মিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ৫ই আগস্ট তারিক বিজয় মিছিলে অংশ নেয় এবং বিকাল তিনটা পর্যন্ত গণভবনের সামনে অবস্থান করে। পরে বন্ধুদের সঙ্গে বাসায় ফিরে আসে কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার বাসার সামনে শেরেবাংলা নগর থানার পাশে বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয়। সেখানে কিছু পুলিশ থানার ভেতরে আটকা পড়েছিল। বাইরে ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী নানারকম স্লোগান দিচ্ছিল। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলে পুলিশ থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ চায়। মানবিকতাবশত ছাত্ররা তাদের দাবি মেনে নেয় এবং তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। পুলিশ বাহিনী থানার একটু সামনে চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছানোর পর ছাত্ররা স্লোগান দেওয়া শুরু করলে হঠাৎ পুলিশ বাহিনী পিছন ফিরে গুলি শুরু করে। তখন অনেকেই আহত হয় তাদের মধ্যে তারিকও ছিল। দ্রুত তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে টানা ৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৯ই আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৪টায় তারিক হাসান শাহাদত বরণ করে। শহিদ তারিকের বাবা মো. আশাদুল ইসলাম পেশায় রিকশাচালক ও মা ফিদুশি খাতুন গৃহিণী। তার বড়ো ভাই আসমাউল রিকশাচালক। ছোটো বোন আছরিফা খাতুন শিক্ষার্থী।



মো. মাহাবুব হাসান নিলয়

গেজেট নং: ৬০

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ১৪

সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল মাহাবুব হাসান নিলয়। জন্ম ১৮ই জুলাই ২০১১। শহিদ মাহাবুব ফুটবল খেলতে ভালোবাসত। তাই মাঠেই সময় কাটাতো বেশি। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সকাল ১১টায় পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। সকাল ৮টা বাজতেই নিলয়ের মন মিছিলের জন্য ছটফট করতে থাকে। সদ্য সৌদি আরব থেকে ফেরা বড়ো ভাই মেহেদী হাসান মিলন, বোন মাহবুবা নাজনীন এবং মাহবুব হাসান নিলয়- তিন ভাইবোনই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। মা বললেন, 'তোমরা মিছিলে যাবে, তাহলে তোমাদের লাঠি কোথায়?' মায়ের কথা শুনে মাহাবুব যেন আরও সাহস পায়, নিজেই তিনটি লাঠি বানিয়ে নেয়। এরপর মাহাবুব পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের সামনে চলে যায়। ইতোমধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সেখানে জমায়েত হয়। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে পাবনা ট্রাফিক মোড়ে অবস্থান নেয়। তারা সেখানে দেশাত্মবোধক গান গাইছিল। প্রায় ৪০ মিনিট পর হঠাৎ একটি জিপগাড়ি নিয়ে মিছিলের উত্তর পাশের রাস্তায় উপস্থিত হয় একদল সন্ত্রাসী বাহিনী। গাড়ি থেকে নেমে কিছু লোক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। শিক্ষার্থীরা দিগবিদিক ছুটতে শুরু করে। মুহূর্তেই চিৎকার আর আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে পাবনা ট্রাফিক মোড়ের বাতাস। তখনই একটি গুলি এসে মাহবুবের বুকে লাগে। সাথে সাথে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফুটবলে দারুণ পারদর্শী ছিলেন শহিদের বাবা মো. আবুল কালাম আজাদ। তিনি আনসার বাহিনীর একজন সদস্য। মা দিল আফরোজা একজন গৃহিণী। পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪। পরিবারের অন্যান্য সদস্য বড়ো ভাই মেহেদী হাসান মিলন সৌদি প্রবাসী ছিলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন। বোন ওয়াকিয়া নাজনীন ছাত্রী (বিবাহিত) আরেক বোন মাহবুবা নাজনীন। ছাত্রী (দশম শ্রেণি) তাদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ব্রজনাথপুর, ইউনিয়ন- দোগাছি, থানা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা।



মো. জুলকার নাইন

গেজেট নং: ১২৬

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ১৫

জেএল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল মো. জুলকারনাইন। তারা থাকত সাভারে। জুলকারনাইনের জন্ম ২৯শে জানুয়ারি ২০০৭। গ্রামের বাড়ি: স্বরুপ, নন্দনপুর, সাথিয়া পাবনা। শহিদ জুলকারনাইনের ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। নিজস্ব একাডেমিতে নিয়মিত খেলত। এছাড়া বড়ো ব্যবসায়ী হওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করত। সে বলত, 'আমি কখনো কারো অধীনে চাকরি করব না, যদি চাকরি করতে হয়, তাহলে আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবো। শহিদ জুলকারনাইন শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা ছিল না, ছিল একজন সংগ্রামী মানুষও। শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বৈরাচারী প্রশাসনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তার ভেতরে ছিল অদম্য সাহস। শহিদ জুলকারনাইন ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে তার মায়ের কাছ থেকে আন্দোলনে যাওয়ার অনুমতি নেয়। বাবার নিষেধ উপেক্ষা করে সেদিন বিকেলে ছাত্র-জনতার সাথে বাইপাইল মোড়ে অবস্থান নেয়। বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে জুলকারনাইনের গলায় গুলি লাগে। শিক্ষার্থীরা দ্রুত তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে সংগ্রামী এই তরুণ শাহাদত বরণ করে।

শহিদের বাবা মো. আ: হাই আলহাদি সাভারে একটি ছোট্ট হোমিওপ্যাথির দোকান চালান। মা মোছা. হালিমা খাতুন গৃহিণী। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছোটো ভাই হামজা, প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বড়ো বোন তোহফা বিবাহিত এবং গৃহিণী। বর্তমান ঠিকানা: পলাশবাড়ি কাঁঠাল তলা, আশুলিয়া।



মো. সাব্বির হাসান

গেজেট নং: ৪৪৮

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৩১

মো. সাব্বির হাসান বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার সুখানপুকুর ইউনিয়নের তেলিহাটা (মধ্য পাড়া) গ্রামে ৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে। সুখানপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল বিভাগের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল সাব্বির হাসান। ৫ই আগস্ট সাব্বির হাসান বিজয় মিছিল থেকে ফেরার পথে বিকাল চারটার দিকে শিহিপুর পশ্চিমপাড়া নান্নু আকন্দের বাড়ির সামনে পৌঁছালে স্থানীয় পলাশ গ্রুপ তাদের ধাওয়া করে। তখন সাব্বিরসহ চারজন একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসীরা সেখানে তাকে খুঁজে পায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে। সেই আঘাতে সাব্বির শাহাদত বরণ করে। মৃত্যু নিশ্চিত করে তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখে সন্ত্রাসীরা। পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে সাব্বিরকে সেখান থেকে আনতে গেলে সন্ত্রাসীরা পরিবারের লোকজনকেও ধাওয়া করে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা সাব্বির হাসানকে হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদের বাবা শাহিন আলম গার্মেন্টস কর্মী। মা মোছা. ফাতেমা বেগমও গার্মেন্টস কর্মী। মা-বাবা চাকরির কারণে ঢাকায় থাকতেন। কিন্তু শহিদ সাব্বির বগুড়ায় তিন বছর বয়স থেকে দাদা-দাদির সাথে বসবাস করত।

মেধাবী এই শিক্ষার্থীকে দাদা-দাদি কখনোই মা-বাবার অভাব বুঝতে দেননি। তাই দাদা-দাদি ছিলেন সাব্বিরের সবকিছু। আদরের নাতিকে তারা খুব কষ্ট করে বড়ো করেন। দাদা দিনমজুর হিসেবে অন্যের জমিতে কাজ করেন, ছোট্ট একটি ভাঙা টিনের ঘরে তারা নাতিকে নিয়ে বাস করতেন।



মো. আব্দুল আহাদ সৈকত

গেজেট নং: ৪৯০

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৩২

বছরের শেষ দিন ২০০৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বগুড়ার সোনাতলা থানার উত্তর দিঘলকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে শহিদ আব্দুল আহাদ সৈকত। পড়ত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম বর্ষে। বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষার্থী প্রতি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করত এবং শিক্ষা জীবনে পেয়েছে অসংখ্য পুরস্কার। অসম্ভব মেধাবী এই তরুণের স্বপ্ন ছিল একজন চিকিৎসক হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার। টগবগে তরুণ মেধাবী ছাত্র ছিল শহিদ আব্দুল আহাদ সৈকত। কতটুকুই বা বয়স, তবুও মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে এগিয়েছিল সবার আগে। ৫ই আগস্ট ২০২৪ শিকলাবদ্ধ বাংলাদেশিদের জীবনে এক মহামুক্তির দিন। শহিদ সৈকত এবং তার বাবা একসাথে আসরের নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে সে তার বাবাকে বলে আমি দশ মিনিট পরে আসছি। তার বাবা তাকে মিছিলে যেতে নিষেধ করেন। বাবাকে না বলে সৈকত মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বিজয় মিছিল সাভার মডেল থানার সামনে আসলে আওয়ামী পুলিশ বাহিনী বেপরোয়া গুলি শুরু হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যায় সৈকত। বন্ধুরা তাকে সাথে সাথে সাভার এনাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। সৈকতের বন্ধুরা তার বাবাকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানায়। সৈকতের বাবা হাসপাতালে পৌঁছালে ডাক্তাররা তাকে জানায় তার ছেলেকে আর বাঁচানো সম্ভব নয় এবং তাকে তার ছেলের পাশে বসার জন্য বলেন, ছেলে শেষ কথা কিছু বলে কি-না তা শোনার জন্য। বাবা ১০ মিনিট বসেছিলেন ছেলের পাশে। একপর্যায়ে সৈকত বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

মা-বাবা ও এক বোন নিয়ে তাদের পরিবার। বাবা মো. নজরুল ইসলাম আগে বায়িং হাউসে চাকরি করলেও ২০১৯ সাল থেকে কর্মহীন, মা মোছা. আম্বিয়ারা বেগম, গৃহিণী। বোন নাজমুন নাহার অনার্স প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করছেন। শহিদের বর্তমান ঠিকানা: শাহিবাগ, ডগরমোড়া, সাভার কলেজের পাশে, সাভার, ঢাকা।



সিয়াম শুভ

গেজেট নং: ৯৬

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৩৯

বগুড়ার চক সুত্রাপুরের হাড্ডিপট্টি এলাকায় সিয়াম শুভ ২০০৮ সালের ১০ই মার্চ জন্মগ্রহণ করে। শুভ পেশায় ছিল একজন ভাঙাড়ি ব্যবসায়ী। ১৯শে জুলাই সকাল থেকেই বগুড়া সদরের বিভিন্ন জায়গায় চলছিল বিক্ষোভ মিছিল। দুপুর একটার দিকে বাসা থেকে বের হয় সিয়াম শুভ। মা-বাবা মিছিলে যেতে নিষেধ করলে বলে, 'দেশ স্বাধীন করতে যাচ্ছি'। মিছিলটি সেউজগাড়ী কালিয়া বাজারের আমতলী মোড়ে অবস্থান করছিল। বিকাল ৪টার দিকে অসংখ্য রাবার বুলেট সিয়ামের মাথায়, বুকে, চোখে এবং মুখে বিদ্ধ হয়। একপর্যায়ে শুভ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক আন্দোলনকারীরা তাকে রাবেয়া ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদ সিয়াম শুভ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে নিজস্ব ভ্যানে করে পরিত্যক্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করত। শহিদের বাবা মো. আশিক শেখ একজন বাস ড্রাইভার। মা মোছা.শাপলা বেগম। সিয়াম পরিবারসহ চক সুত্রাপুর গ্রামের হাড্ডিপট্টি রেলস্টেশনের বস্তিতে বসবাস করত। তারা মোট পাঁচ ভাইবোন। তার ভাই শাওন বেকার। ছোটো বোন ছোয়া ও ছড়া স্থানীয় যুবিনী স্কুলে পড়াশোনা করে। শিশির নামে শুভর ছোটো আরো একটি ভাই রয়েছে।

স্থায়ী ঠিকানা: চকসূত্রাপুর বগুড়া- ৫৮০০, ওয়ার্ড-৪, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া সদর, বগুড়া।



জাকোয়াত খান, পঞ্চম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



সাবিত ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



মোছা. রিতা আক্তার

গেজেট নং: ৩৩১

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৪৩

জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার অন্তর্গত পুনট ইউনিয়নের তালখুর গ্রামে ২০০৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করে রিতা আক্তার। দুই ভাইয়ের একমাত্র বোন রিতা আক্তার ছিল অত্যন্ত আদরের। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় পিতা-মাতা দুই ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। রিতা বড়ো হতে থাকে এলাকায় তার মামির কাছে। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় শিক্ষার্থী রিতা দ্রুতই মাদ্রাসার শিক্ষকদের নজরে আসে। গ্রামের ভূগোইল হেজবুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২০২৪ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করে রিতা। বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষার্থীর জিপিএ ছিল ৪.৭৮। পিতামাতা আশায় বুক বাঁধেন। সিদ্ধান্ত নেন যত কষ্টই হোক তাকে লেখাপড়া শিখাবেন। ভর্তি করিয়ে দেন মিরপুরের দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজে। রিতা আক্তার ৫ই আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মাতা-পিতার কাছে অনুমতি চায় কিন্তু তারা তাকে অনুমতি দেননি। বাবা রিকশা নিয়ে বের হলে এবং মা অন্যের বাসায় কাজে গেলে সে আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সাথে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তখন মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে যাচ্ছিল। দুপুর ১.৩০ মিনিটে মিছিল মিরপুর ২নং মডেল থানার সামনে পৌঁছালে হঠাৎ পুলিশ বাহিনী এলোপাতারি গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেখানেই ৫-৬ জন শিক্ষার্থী মাটিতে ঢলে পড়ে। তাদের সাথে রিতা আক্তারও আহত হয়। তার মা বাসায় এসে তাকে না পেয়ে খুঁজতে বের হয়। মিরপুর মডেল থানার সামনে ব্রিজের পাশে রিতাকে পড়ে থাকতে দেখে। সে তখনো জীবিত ছিল কিন্তু তাকে ধরার কোনো শক্তি তার মায়ের গায়ে ছিল না। মা দ্রুত বাসায় এসে এক জনকে সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু গিয়ে রিতাকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিকে শিক্ষার্থীরা রিতা আক্তারকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে পৌঁছায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টার দিকে রিতা আক্তার শাহাদত বরণ করে।

শহিদ রিতা আক্তারের পরিবারে রয়েছে তার মা-বাবা, বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই। ছোটো ভাই একটি বেসরকারি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। বড়ো ভাই অন্যের দোকানে মুরগি বিক্রি করে। বাবা মো. আশরাফ আলী রিকশা চালায়। মা মোছা. রেহেনা বিবি অন্যের বাসায় কাজ করে। ঢাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে তারা থাকেন।



মো. মিনহাজ হোসেন

গেজেট নং: ৩২৯

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৪৬

মিনহাজ হোসেনের জন্ম জয়পুরহাটের রামশালা গ্রামে ১লা এপ্রিল ২০০৮ সালে। এ গ্রামেই মিনহাজের বেড়ে ওঠা। পড়াশোনার হাতেখড়ি নিয়েছিল পাঠশালায়। করোনার আগ পর্যন্ত মাদ্রাসায় পড়েছে, করোনাকালীন সময়ে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মিনহাজ ঢাকায় চলে আসে এবং একটি এমব্রয়ডারি প্রতিষ্ঠানে কাজ শিখে। পরবর্তীতে মিনহাজ নিউ কমার্স গার্মেন্টস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সহকারী অপারেটর হিসেবে চাকরি নেয়। ২০শে জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সারাদেশে যখন ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। যে যার মতো নিজ জায়গাতেই আন্দোলনে নেমে পড়ে সবাই। তখন নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি কিশোর মিনহাজও। সে গাজীপুরের বড়বাড়ীর একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। ২০শে জুলাই বেলা ১১টার দিকে বন্ধুরা ফোন দিয়ে তাকে নিচে নামতে বলে। সাথে সাথেই সাড়া দেয় সে। বড়বাড়ীতে শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের মিছিলটি যখন দুপুর ১২টার দিকে জয়বাংলা রোডে পৌঁছায়, হঠাৎ শিক্ষার্থীদের দিকে মুহুর্মুহু গুলি আসতে থাকে। সেখানেই আহত হয় মিনহাজ। তাকে দ্রুত জয়দেবপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ডাক্তাররা তাকে শহিদ ঘোষণা করেন।

মালয়েশিয়া প্রবাসী মিনহাজের বাবা মো. বক্কর সরদার, মা মোছা. মেরীনা বিবি। স্থায়ী ঠিকানা: রামশালা; জাফরপুর; আক্কেলপুর; জয়পুরহাট। মিনহাজ যখন শহিদ হয়, তখন তার বাবা ছিলেন দূর প্রবাসে। সন্তানের মৃত্যুর সংবাদে দেশে ফিরে আসলেও সন্তানের মুখটি শেষবারের মতো দেখতে পারেননি তিনি। মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। মিনহাজ তার মায়ের দেখাশোনা করত। মাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিল চিকিৎসা করাতে, কিন্তু মায়ের সুস্থতা না দেখেই শহিদ হলো মিনহাজ।



মিকদাদ হোসাইন খান

গেজেট নং: ২৮৯

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৫১

মিকদাদের ডাক নাম আকিব। সে নাটোর জেলার আলাইপুর গ্রামে ২২শে মে ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ছিল মা-বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান। আকিব নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। সে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ হওয়ার পর তার ঘর থেকে পাওয়া ডায়েরিতে দেখা যায় সে একটি দোকান থেকে ১৫ টাকা বাকি নিয়েছিল এবং সেটাও সতর্কতার সঙ্গে লিখে রেখেছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও ছিল চৌকষ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় তার বাবা মো. দেলোয়ার হোসেন খানকে মিথ্যা মামলায় আটক করা হয়। বাবা জেলে থাকায় পরিবারের উপর মানসিক চাপ তৈরি হয়। অন্যদিকে চারদিকে মানুষের অধিকারের লড়াই। এসব নিয়ে আকিবের ভীষণ মন খারাপ থাকত। তবুও সে আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। ৫ই আগস্ট, ২০২৪ যখন খবর প্রকাশিত হয় হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, তখন বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় আনন্দ মিছিল বের হয়। তেমনই হাজার হাজার মানুষের মতো আকিবও গিয়েছিল বিজয় উদযাপন করতে। নাটোরের বেশিরভাগ মানুষের গন্তব্য ছিল অত্যাচারী এবং দুর্নীতিবাজ স্থানীয় এমপি বাড়ি। ওই বাড়িতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। হাসিনার পদত্যাগের খবর পেয়ে এমপি পালিয়ে যায়। তখন হাজারো কৌতূহলী জনতার সাথে আকিবও তার বাসায় হাজির হয়। আকিব সবার সঙ্গে উপরে উঠেছিল। হঠাৎ নিচতলায় আগুন ধরে যায়, আর সবাই যে যার মতো পালানোর চেষ্টা করে। একটি অটো লক হওয়া রুমে আটকা পড়ে আকিবসহ কয়েকজন। অনেক চেষ্টা করেও তারা ওই রুম থেকে বের হতে পারেনি। অন্যসবার সাথে আকিবও আগুনে পুড়ে শহিদ হয়। কিন্তু এরই মধ্যে খবর আসে আকিবকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় আকিবের পোড়া মরদেহ নাটোর সদরের এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুলের বাড়িতে পাওয়া গেছে।

আকিবের বাবা নাটোর সিটি কলেজের একজন অধ্যক্ষ। মা মোসা. ডেজী খাতুন। বাবা-মাসহ তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। আকিবরা ছিল তিন ভাইবোন। বড়ো এক বোন ও ছোটো এক বোন এবং একমাত্র ছেলে ছিল আকিব। স্থায়ী ঠিকানা: ৭২, উপশহর, আলাইপুর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর।



মো. জুনাইদ ইসলাম রাতুল

গেজেট নং: ৪৭

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ৫৫

রাতুল বগুড়া শহরের সুলতানগঞ্জপাড়া, ঘোনপাড়ার মুদি দোকানি বাবা মো. জিয়াউর রহমান ও মা রোকেয়া বেগমের ছেলে। নিশিন্দারা উপশহর পথ পাবলিক স্কুল ও কলেজে যষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল রাতুল।

ছাত্ররা কোটা সংস্কারের দাবিতে এবং দেশব্যাপী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২রা আগস্ট 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত করে সাতমাথা মোড়। ৪ঠা আগস্ট সরকারি বাহিনীর হামলা দেশবাসী প্রতিহত করে। ৫ই আগস্ট তীব্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ভারতে চলে যায়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতারা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আশ্রয় নেয়।

৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর জুনায়েদ বন্ধুদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। তার সাথে বোন ও ভগ্নিপতিও ছিলেন। বিকেল চারটার দিকে ছাত্র-জনতার মিছিল শহরের বড়গোলা থেকে সাতমাথা এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করলে সদর থানার সামনে পুলিশ ছাত্র-জনতার মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পুলিশের ছোড়া শটগানের গুলি রাতুলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয় ছোট্ট রাতুল। একটি গুলি বাম চোখের মধ্য দিয়ে মাথায় ঢুকে যায়, এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছররা গুলি বিদ্ধ হয়। রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় রাতুলকে প্রথমে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসকরা তার মগজ থেকে একটি গুলি বের করেন। মোট ৩৬টি গুলি অপসারণ করা হয়েছিল। এরপর তাকে আইসিইউতে রাখা হয়। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে রাতুলকে ওয়ার্ডের বেডে রাখা হয়। ওয়ার্ডে দেওয়ার পর রাতুল কথা বলেছে, খাওয়াদাওয়াও করেছে। সে অবস্থায় ভোর ৪টার দিকে হঠাৎ তার অবস্থার অবনতি ঘটে। ৪৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় সে। সকাল ৯ টায় সরকার মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ১ম জানাজা এবং ২য় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় হাকির মোড় এলাকায়। শহরের নামাজগঞ্জ আঞ্জুমান-ই-গোরস্তানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা: সুলতানগঞ্জ পাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।

বরিশাল বিভাগ



মো. সিফাত হোসেন

গেজেট নং: ৭০০

আইডি: বরিশাল বিভাগ ১২

ছায়েদ আল হাওলাদার দারুসসুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র মো. সিফাত হোসেন ছিল ১৬ বছরের টগবগে কিশোর। মাদ্রাসায় পড়ালেখার পাশাপাশি মামার দোকানে কাজ করে পরিবারকে সাপোর্ট দিত সে। পরিবারের তৃতীয় সন্তান সিফাত ২০০৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বরিশাল জেলার মুলাদি থানার খৈলার চর ইউনিয়নের খৈলা চরপদ্মা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র হিসেবে সিফাতও সচেতনভাবে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। মমতাময়ী মা বারণ করলে মাকে সরকারের বৈষম্যের ব্যাপারে তথ্য তুলে ধরে বুঝিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কয়েকবার টিয়ারশেলের আঘাতে আহত হয়েছিল সিফাত। ৫ই আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। স্বৈরাচারি সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ায় সারা দেশের মানুষ খুশিতে রাস্তায় নেমে বিজয় উল্লাস করে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো সিফাতও বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিল বংশাল থানা অতিক্রম করার সময় মিছিলে বাধা দিয়ে গুলি ছুড়ে প্রশাসন। এ সময় অসংখ্য মানুষ আহত হয়, মুহূর্তে বিজয় মিছিল আতঙ্কে রূপ নেয়। সিফাত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওর পরিচিতজনরা কেউ পাশে না থাকায় এবং ভীতিকর অবস্থা থাকায় চিকিৎসার জন্য তখন কেউ এগিয়ে আসেনি।

বিজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণার পর সিফাতের জায়গা হয় মিটফোর্ড হসপিটালের মর্গে। সিফাতের কোনো খোঁজ না পেয়ে হন্যে হয়ে চারদিকে খুঁজতে থাকে মা। টিভি চ্যানেলে ছবি দেখে প্রাথমিকভাবে ওর কাজিন সিফাতকে চিনতে পারে। অবশেষে পরিবার জানতে পারে সিফাত শহিদ হয়েছে। প্রবাসী বাবা মো. জাহাঙ্গীর ও গৃহিণী মা আকলিমা। বড়ো বোন বিবাহিত, ছোটো ভাই হিফজ পড়ছে।



সরোয়ার হোসেন শাওন

গেজেট নং: ৭৪৩

আইডি: বরিশাল বিভাগ ১৪

বৃহত্তর বরিশালের নদী পরিবেষ্টিত থানা মেহেন্দিগঞ্জ। এই থানার উলানিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম পানবারিয়া। নদীবিধৌত এই থানায় ২০০৯ সালের ৩রা জুন মাতা-পিতার কোল আলো করে জন্মেছিল মো. সরোয়ার হোসেন শাওন। অভাবের কারণে তার বাবা জাকির খান তেমন পড়াশোনা করতে পারেননি। এই একই অভাবের হাতছানিতে শাওনের পড়াশোনাটাও বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মাদ্রাসা, সেখানেই পড়ার স্বপ্ন ছিল শাওনের। পরিবারের ছোটো বোনদের পড়াশোনার খরচ ও বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য শাওন বাধ্য হয় কাজ খুঁজতে। করোনা চলাকালীন সময়ে মাত্র নবম শ্রেণিতে থাকাকালীন মাতা-পিতার অসুস্থতা ও পরিবারের দারিদ্র্যতার কারণে অল্প বয়সে পরিবারের হাল ধরতে ঢাকায় চাকরিতে যোগ দেয় শাওন। চাকরির পাশাপাশি ভোকেশনালে ভর্তি হয়ে যায়। ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই শাওনের ইচ্ছে ছিল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার।

১৮ই জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। শহিদদের আত্মত্যাগ শাওনকে অনুপ্রাণিত করে আন্দোলনে নামতে। ১৯শে জুলাই জুম্মার নামাজ পড়ে বাসায় এসে দুপুরের খাবার খেয়েছিল শাওন। খাবার শেষ হওয়ার পরে শাওনের মা তাকে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিল শাওন বাসায় নাকি বাসার বাহিরে। সে ফোনে মাকে বলেছিল বাসায়। কথা বলার এক পর্যায়ে শাওনের মা ফোনে বিকট ধরনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে শাওন বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং মিছিলে যোগ দেয়। শাওনের আন্দোলনে যোগদানের স্থান ছিল রামপুরার একরামুন্নেসা স্কুলের প্রধান গেট। মিছিল নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ, বিজিবি অতর্কিত হামলা চালায়। শাওনও ছিল এই মিছিলের প্রথম সারিতে, তাই তো হট্টগোলের মধ্যেই আনুমানিক দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে হঠাৎ করে একটা বুলেট এসে লাগে শাওনের গায়ে। মুহূর্তের মধ্যেই শাওন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে আহত শাওনকে কাঁধে করে অনেক কষ্টে কোনোরকমে একটা গাড়ি ঠিক করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছার আগেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শাওনের শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে। শহিদ হয় শাওন। শাওনের বাবা মো. জাকির খান পেশায় কৃষক ও মা সেলিনা বেগম গৃহিণী। গ্রামের বাড়ি বরিশালে। শাওনের বোন আফরিন আক্তার বন্যা ৯ম শ্রেণিতে পড়ে।



রাকিব হাওলাদার

গেজেট নং: ৫১৯

আইডি: বরিশাল বিভাগ ২০

ঝালকাঠি জেলায় রাকিব হাওলাদার ২২শে মে ২০০৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। রাকিব হাওলাদার তার চেতনা, বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এদেশের মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবে। রাকিব বাল্যকাল থেকে ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমী। মাঝে মাঝে মসজিদে যেয়ে নিজে আজান দিত। ঢাকায় বাবার ব্যাবসা দেখার পাশাপাশি চানখারপুল এলাকায় একটি প্লাস্টিক কোম্পানিতে চাকরি করত। জুলাই মাস জুড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ৪ঠা আগস্ট উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে রাকিব হাওলাদার অংশ নেয়। রাজপথে নেমে পরিবারের কাছে আন্দোলনে আছি বলে দোয়া চায়। মা-বাবা আপত্তি করেন। তাকে ঘরে থাকার জন্য উপদেশ দেন। রাকিব হাওলাদার জবাবে বলেন, 'আমরা যদি আন্দোলন না করি তাহলে এই স্বৈরাচারের পতন হবে না'। সকাল ১১ টায় বোরহান উদ্দিন কলেজের চানখারপুল এলাকায় স্বৈরাচারী সরকারের আদেশে তার বাহিনীর আঘাতে রাকিব হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হয়। সাথে সাথেই সে শহিদ হয়।

রাকিবের বাবা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ও মা শিল্পী বেগম। রাকিবের ৩ ভাই- সাইদুল হাওলাদার, রাহাত হাওলাদার ও রাব্বী হাওলাদার। ভাইয়েরা সবাই চাকরি ও ব্যাবসায়ের সাথে জড়িত। তার বোন. জান্নাতি হাওলাদার দশম শ্রেণি চুনকুটিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। স্থায়ী ঠিকানা: মহিষকান্দি, রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।



মো. আমিন

গেজেট নং: ৩০১

আইডি: বরিশাল বিভাগ ৩১

পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার কেশবপুর ইউনিয়নের ভরী পাশা গ্রামে ২রা আগস্ট ২০০৯ সালে মো. আমিন জন্মগ্রহণ করে। দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ছেলে আমিন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে দারিদ্র্যতার কারণে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে ঢাকার একটা বৈদ্যুতিক সুইচ তৈরির কারখানায় কাজ নেয়। আমিন ফুটবলার হতে চেয়েছিল। শহিদ হওয়ার তিন চার মাস আগে এলাকায় ফুটবল খেলে একটি ক্রেস্ট পেয়েছিল। মাকে বলেছিল এটি তার জীবনের প্রথম পুরষ্কার।

২১শে জুলাই বিকেল ৫টার দিকে আমিন ঘুম থেকে উঠে দোকান থেকে রান্না করার জন্য মাকে চাল এনে দেয়। এরপর মায়ের কাছ থেকে ২০ টাকা নিয়ে বাসা থেকে বের হয়। সেই ২০ টাকা তার পকেটেই ছিল। বাসার সামনে থাকা একটি দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন দেখছিল আমিন। ফ্যাসিস্ট সরকারের বাহিনী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। হঠাৎ একটি গুলি আহত করে আমিনুলকে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমিন বাসার দিকে ছুটে আসতে চাইলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় দুই যুবক তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে রিকশা খুঁজতে থাকে। প্রতিদিনের মতো ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হন আমিনের পিতা ওবাইদুল খা। যাত্রাবাড়ি এলাকার অনাবিল হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ এক কিশোরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানান দুই পথচারী। তিনি রাজি হলেন। গুলিবিদ্ধ সেই কিশোরকে অটোরিকশায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে কোলে করে নামানোর সময় মুখ দেখে চমকে ওঠেন ওবায়দুল। সেই কিশোরকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চিৎকার করে ওবায়দুল বলেন, 'এ তো আমার কলিজার টুকরা' এ সময় তার আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পুরো হাসপাতাল এলাকা। একমাত্র সন্তানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আমিন শাহাদত বরণ করেছে। পিতা ওবাইদুল খা পেশায় রিকশাচালক এবং মা সেলিনা বেগম গৃহিণী। আমিনের পরিবার ঢাকার কদমতলী এলাকার দক্ষিণ দনিয়ায় একটি টিনশেডের বাসায় ভাড়া থাকত।



মো. ইয়াসিন

গেজেট নং: ৫৭৩

আইডি: বরিশাল বিভাগ ৫৩

ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার দেউলা বড়পাতা গ্রামে শহিদ মো. ইয়াসিন ৫ই জুলাই ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করে। শহিদ মো. ইয়াসিন ছোটো থেকে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিল। কিন্তু পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনায় বেশি এগিয়ে যেতে পারেনি। বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য ঢাকায় এসে রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করে ইয়াসিন। চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১লা জুলাই থেকে। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে শুরু করে। এক দিকে আন্দোলন অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের দমনের চেষ্টা। ১৯শে জুলাই ২০২৪ বিকেল ৪টায় ঘাতক সরকারের বাহিনী ইয়াসিনকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে ঢাকার যাত্রাবাড়ি সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তার উপর ফেলে চলে যায়।

ইয়াসিনের বাবা লালু মিয়া একজন কৃষক এবং মা লিলুফা গৃহিণী। মো. ইয়াসিনের বড়ো পরিবার। বড়ো ৪ ভাই বিবাহিত এবং তারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সংসার চালান। ছোটো বোন বিবাহিত।



মাশরুর সাহজায়ীব সৌমিক, স্ট্যান্ডার্ড-২, রাইজ স্কুল, সিলেট



রূফাইদা বিনতে মনজুর, নার্সারি শ্রেণী, লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, কাজীপাড়া ঢাকা



বাহাদুর হোসেন মনির

গেজেট নং: ৬৪৪

আইডি: বরিশাল বিভাগ ৫৮

ছোটো থেকে লেখাপড়ায় মনোযোগী মো. বাহাদুর হোসেন মনির ১৮ই জুন ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনা বেশি করতে পারেনি। তার পরিবার অনেক কষ্ট করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। অভাবের তাড়নায় ও পরিবারের প্রয়োজনে অল্প বয়সেই তাকে জীবন সংগ্রামে নামতে হয়েছিল।

দেশের ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী এই মনির দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে। মো. বাহাদুর হোসেন মনির বন্ধুদের সাথে ঘুরতে সিলেট গিয়েছিল। সরকারের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে কোটা প্রথা পুনর্বহাল হলে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয় ছাত্রসমাজ। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করে ফিরে আসে ঢাকায়। প্রতিদিনই বাবা-মাকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ত আন্দোলনে, অংশগ্রহণ করত সমন্বয়কদের ঘোষণা করা বিভিন্ন কর্মসূচিতে। বাবা 'কোথায় যাচ্ছ' জিজ্ঞেস করলে মনির আন্দোলনে যাওয়ার কথা গোপন করত। ১৯শে জুলাই জোহরের নামাজের পর মনির দুপুরের খাবার খেয়ে রাস্তায় নামলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। দুষ্কৃতিকারীদের মুহুর্মুহু গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা। নতুনবাজার বাঁশতলা এলাকায় ছাত্রদের মিছিলে মারাত্মকভাবে আহত হয় মনির। এরপর ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করে। মনিরের বাবা মো. জাহের (জাফর), মা জাহানারা বেগম। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: ভাষানচর ৪নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন: রসুলপুর, থানা: শশীভূষন, উপজেলা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা।



ওমর ফারুক

গেজেট নং: ৫৮৪

আইডি: বরিশাল বিভাগ ৭১

ওমর ফারুক ভোলা জেলার লালমোহন থানার চরভূতা ইউনিয়নের হরিগঞ্জ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২০০৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করে। মা-বাবার চার সন্তানের মধ্যে ফারুক ছিল তৃতীয়। নিজে একটি কয়েল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে দিনমজুরি করত। ছোটোবেলাতে স্থানীয় এক মক্তবে হাতেখড়ি তার। প্রবল মেধাবী ওমর ফারুক অল্প দিনেই কুরানের প্রায় ২০ পারা হিফজ করে। ছোটো থেকেই নিয়মিত নামাজ আদায় করত। তাই বড়োদের স্নেহ ও ছোটোদের ভালোবাসার পাত্র ছিল ফারুক। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও শহিদ ওমর ফারুক ছিল নির্লোভ এবং কষ্টসহিষ্ণু। জুলাই মাস থেকে দেশের সর্বত্রই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন আর স্বৈরাচার সরকারের প্রতিরোধ শুরু হয়। রাজধানী ঢাকার অন্যতম প্রবেশপথ যাত্রাবাড়ি এলাকা আন্দোলনের প্রথম থেকেই 'রেডজোন' এরিয়া ছিল। ১৯শে জুলাই, ২০২৪ চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ডাকে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি। অপরদিকে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে। কিন্তু সারা দেশে ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাস্তায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেদিন যাত্রাবাড়ি এলাকার দনিয়া কলেজের সামনে সারাদিন আন্দোলনের সাথে রাজপথে ছিল ওমর ফারুক। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে বিক্ষোভ মিছিলে হামলা শুরু হয়। অন্দোলনে অংশ নেওয়া অন্য সবাইকেই বারবার সতর্ক করছিল ফারুক। আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেও অন্য সবাইসহ ফরুক থেকে যাচ্ছিল রাজপথেই। এমনই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তে কয়েকটি বুলেট এসে ওমর ফারুকের বুক ঝাঁজরা করে দেয়। স্থানীয় লোকজন ওমর ফারুককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে রাজধানীর মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ২রা আগস্ট ২০২৪ রাত ৩টার সময় ইন্তেকাল করে।

ওমরের বাবা ফয়জুল্লাহ মুন্সী সিকিউরিটি গার্ড এবং মা হামিদা বেগম। ঢাকার রায়েরবাগ টিনের ভাড়া বাসায় থাকতেন তারা। তার বোন হাফসা বেগম বিবাহিত। বড়ো ভাই আল ইমরান ফাজিল ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী, এবং ছোটো বোন আফসানা ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। দুজনেই ভোলা জেলার লালমোহন ইসলামীয়া কামিল মাদ্রাসায় পড়ছে।

খুলনা বিভাগ



সামিউর রহমান সাদ

গেজেট নং: ৩৩৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ২

জুলাই বিপ্লবে এদেশের বুকে আঠারো এসেছিল নেমে। এমনি এক আঠারো বছরের বিপ্লবী তরুণ হলো সামিউর রহমান সাদ। সামিউর ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারি যশোর জেলার সদর থানার পূর্ব বারান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে।

সাদ যশোরের বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে একাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ছিল। ছোটোবেলায় শিশু সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। নিয়মিত নামাজ পড়ত। তার পছন্দ ছিল ছবি তোলা এবং জিম করা। ৫ই আগস্ট দুপুরবেলা সাদ তার বাবা-মাসহ দুপুরের খাবার খাচ্ছিল। তখন তার সহপাঠীরা তাকে কল দিয়ে বলে সরকার পদত্যাগ করেছে। বন্ধুদের সাথে দেখা করতে বাবার কাছ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হওয়ার সময় তার এক সহপাঠী মোবাইলে জানায়, জাবের হোটেলে আগুন লেগেছে এবং তার কিছু বন্ধু সেখানে আটকা পড়েছে। তখন সে এলাকার বন্ধুদের সাথে নিয়ে জাবের হোটেলে গিয়ে দুই-তিন জনকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার এক পর্যায়ে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় সাদ চতুর্থ তলায় আটকা পড়ে। তার শারীরিক অবস্থা দেখে ধারণা করা হয়, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়। শহিদ সামিউর রহমান সাদ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই অংশ নেয় এবং সামনের সারিতে থেকে স্থানীয় এলাকায় নেতৃত্বও দিয়েছিল। সে ছিল যশোর জেলা সমন্বয়কদের একজন। আনুমানিক বিকেল পাঁচটার দিকে বন্ধুরা তার বাসায় এসে সাদের বাবাকে জানায় সাদ এর গাড়ি জাবের হোটেলের বাইরে পার্ক করা এবং সাদ ভিতরে আটকা পড়ে আছে। শুনে তার বাবা দ্রুত ছুটে যান ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখেন সেখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। তারা একের পর এক আহত এবং নিহতদের বের করছিল। সাদ-এর বাবা আশা করেছিলেন হয়ত তার ছেলেকেও বের করা হবে। মাগরিবের কিছু আগে খুলনা থেকে একটা ক্রেন দিয়ে ১৬ তলা থেকে রেসকিউ করা হচ্ছিল। তিনি অনেকক্ষণ আশা করেছিলেন এই রেসকিউ টিমের সহায়তায় তার ছেলেকে ফিরে পাবেন। কিন্তু তাকে আর নামানো হলো না। অপেক্ষা করতে করতে রাত প্রায় সোয়া নয়টার দিকে হাসপাতাল থেকে একজন কল দিয়ে তার বাবাকে জানায় যে সাদকে হাসপাতালে শনাক্ত করা গেছে। হাসপাতালের ব্রিজ পার হওয়ার পর তার ভাতিজা তাকে নিশ্চিত করেন সাদ আর বেঁচে নেই।

সাদের পিতার নাম শেখ মতিয়ার রহমান ডাবলু এবং মাতার নাম মোছা. সাজেদা রহমান সাজু। মা-বাবা আর বড়ো বোনকে নিয়ে ৪ সদস্যের পরিবার তাদের। একমাত্র বোন সানজিদা পারভিন যশোর সরকারি এম এম কলেজে মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। বাবা মোটর পার্টসের ব্যাবসা করেন এবং মা গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- পূর্ব বারান্দি, মোল্লাপাড়া, আমতলা, জেলা- যশোর।



আবিদা ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, দয়াগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা



নিমিত, পঞ্চম শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



মো. রিয়াদ শেখ

গেজেট নং: ৬৯১

আইডি: খুলনা বিভাগ ৪

একজন সাহসী ও উজ্জ্বল তরুণ মো. রিয়াদ শেখ। যার জন্ম ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে যশোরের চাঁচড়া গ্রামে। পূর্বপুরুষদের বসত গৌরনদী বরিশাল হলেও বর্তমানে তারা যশোরেই স্থায়ী। যশোর সরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল রিয়াদ। স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি করার। শহিদ মো. রিয়াদ শেখ ছিল এক সাহসী ও আদর্শবান ছাত্র, সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

৫ই আগস্ট ২০২৪ বিকালের দিকে রিয়াদ তার দুই বন্ধু চয়ন ও শান্তকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। পরিবার থেকে তাকে আন্দোলনে না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রিয়াদ পরিবারের অনুরোধ উপেক্ষা করে বন্ধুদের নিয়ে চাঁচড়া মোড়ে ছাত্রদের বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। সেদিনের মিছিলটি ছিল সরকারের পতনের প্রতীক,তাই সাধারণ জনতা আনন্দে ফেটে পড়ে।

মিছিলটি হোটেল জাবের ইন্টারন্যাশনালের কাছে পৌঁছালে জানতে পারে হোটেলটিতে আগুন লেগেছে। রিয়াদ এবং তার বন্ধুরা ছুটে যায় এবং উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে মিলে প্রায় ১৭-১৮ জন মানুষকে উদ্ধার করে। রিয়াদের এই সাহসিকতা তার মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, উপরের তলায় উঠতে গিয়ে কাচের গ্লাস ভেঙে তার মাথায় আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। স্বপ্নবাজ রিয়াদের এইচএসসি পরীক্ষা চলমান ছিল। বাকি পরীক্ষা আগস্টের ১১ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। তার আগে ৫ তারিখেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যায় পরপারে।

রিয়াদের পরিবার ছিল পাঁচ সদস্যের। বাবা মো. কাবিল শেখ, যিনি বর্তমানে বেকার এবং মা মোছা. শাহিনুর বেগম গৃহিণী। রিয়াদের বড়ো ভাই হৃদয় শেখ পেশায় একজন ড্রাইভার। স্থায়ী ঠিকানা: চাঁচড়া, রায়পাড়া, সদর যশোর।



মো. খালিদ হোসেন শান্ত

গেজেট নং: ৭৯৮

আইডি: খুলনা বিভাগ ৬

বাংলাদেশের যশোর জেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের রায়পাড়া গ্রামে ৯ই মার্চ ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে মো. খালিদ হোসেন শান্ত। তার মা-বাবার বিয়ের দীর্ঘ ১৩ বছর পর আল্লাহর অশেষ রহমতে শান্তর জন্ম হয়। শান্ত খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারে তার বাবাই একমাত্র উপার্জনকারী। তিনি পরিবারের সকল চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন।

আন্দোলনের শুরু থেকেই নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণ ছিল শান্তর। ৫ই আগস্ট শান্তর বাবা তাকে এক দফা দাবির আন্দোলনে রাস্তার মোড়ে দেখেছিলেন। এরপর আন্দোলন চলাকালীন একপর্যায়ে হোটেল জাবিরে কৌতূহলবশত ঢুকে পড়ে শান্ত। সেদিন কিছু সন্ত্রাসী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের সেই ধ্বংসযজ্ঞে ছাই হয় জাবির হোটেলটি। রেহাই পায়নি হোটেলে অবস্থানরত খালিদ হোসেন শান্তও। একপর্যায়ে ৯ম তলা থেকে নিজের গায়ের জামা হাতে প্যাঁচিয়ে উড়াতে থাকে আর বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে। আন্দোলনকারীরা শান্তকে উদ্ধার করে আনে কিন্তু ততক্ষণে আগুনে তার পুরো শরীর পুড়ে যায়। সেদিন কমপ্লিট শাটডাউন জারি থাকায় তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এরপর যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে খালিদ হোসেন শান্ত পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে শহিদ হয়ে চলে যায় পরপারে।

তার বাবা মো. মোতালেব মিয়া পেশায় একজন রিকশাচালক, তার মা মোছা. খাদিজা বেগম একজন গৃহিণী। ১৩ বছর পর একটি সন্তান পেয়ে খুশি ছিলেন তারা। কিন্তু ছেলের ১৮ বছর বয়সেই তাকে হারিয়ে ফেলল। শান্তর শহিদ হওয়ার পর তার মা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন, কথা বলতে পারেন না ঠিকমতো।



মো. সাকিবুল হাসান মাহি

গেজেট নং: ৩৩৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৭

প্রতিভাবান শিক্ষার্থী মো. সাকিবুল হাসান মাহি ৫ই ডিসেম্বর ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ৯ম শ্রেণিতে যশোর জেলা স্কুলে পড়াশোনা করছিল। তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যশোর জেলার সদর থানার চাঁচড়া ডালমিল পাড়ায়, যেখানে পরিবারের সাথে মাহি বসবাস করত। পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই গ্রামীণ পরিবেশ সাকিবুলের শৈশবকে রঙিন করেছিল। তার পিতা মো. শহিদুর রহমান মাছ ব্যাবসা করেন এবং মাতা মোছা. আইরিন সুলতানা গৃহিণী।

সাকিবুল হাসান মাহি শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বিশেষ করে যখন রংপুরে আবু সাঈদ শহিদ হয়, সেদিন থেকে মাহি সরাসরি রাজপথের আন্দোলনে যোগ দেয়। ৫ই আগস্ট ২০২৪-এ বিজয়ের দিনে চাঁচড়া চেকপোস্টে ছাত্র-জনতার জমায়েতের খবর পেয়ে মাহি বাসা থেকে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। কিছুক্ষণ পর বিজয় মিছিলে অংশ নিতে তার বাবা ও ছোটো বোনও যুক্ত হোন। ছোটো বোন ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাইলে তারা রেলওয়ের কাছে মাহির দেখা পায়। তখন মাহি বাবাকে বলে, 'বাবা, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি বিজয় মিছিল করে তারপর আসব।' এই কথা বলে মাহি রোড ডিভাইডার পার হয়ে বোনের গালে একটি চুমু খায় এবং মিছিলের অগ্রভাগে চলে যায়। সন্ধ্যার দিকে এলাকার সব ছেলে ফিরে এলেও মাহি বাসায় ফেরেনি। তখন তার বাবা খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন জাবির হোটেলের লাগা আগুনের কথা। মাহি জাবির হোটেলে উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছিল এবং মাহিসহ এলাকার আরও তিনজন ছেলে নিখোঁজ ছিল তখন। এই খবর পেয়ে মাহির বাবা তাকে অনবরত ফোন করেন, কিন্তু ফোন রিসিভ হয়নি। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর মাহিরের ফোনটিও বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর তার বাবা জাবির হোটেলের বাইরে এবং হাসপাতালে পাগলের মতো খোঁজ করেন তার। আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উদ্ধারকর্মীরা মাহিকে মৃত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে তার বাবা মৃতদেহ শনাক্ত করেন। বিজয় মিছিলে অংশ নেওয়া প্রিয় মাহিকে বাবা কাঁধে করে বাসায় নিয়ে আসেন। বাড়িতে শোকের ছায়ায় চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যায়। সারাদেশের শহিদদের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে রংপুরের আবু সাঈদের প্রেরণায়, হৃদয়ে পাথর বেঁধে শহিদ সাকিবুল হাসান মাহিকে চিরবিদায় জানায় তার পরিবার। পরদিন ৬ই আগস্ট সকাল ১০টায় জলমিল মোড়ে প্রায় হাজার মুসল্লির উপস্থিতিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে স্থানীয় চাঁচড়া রাজবাড়ী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মো. মেহেদী হাসান আলিফ

গেজেট নং: ১১৫

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৯



যশোর জেলার সদর উপজেলার পুলেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিল মো. মেহেদী হাসান আলিফ। ২০০৯ সালের ৩রা অক্টোবর যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করে সে। যশোর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড অধিভুক্ত চাঁচড়া আদর্শ পাড়ার জরাজীর্ণ এক ঘরে আলিফ স্বপ্ন দেখত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সেও ছিল একজন সম্মুখ সারির যোদ্ধা। প্রায়শই বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যেত আন্দোলনে। ৫ই আগস্ট ২০২৪ সকালে সে বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনে যায়। যাওয়ার আগে মাকে বলে যায়, 'মা আমি যাচ্ছি'। কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞাসা করলে বাবার ভয়ে সে ইশারায় উত্তর দেয়। বাবা তাকে ডেকে বলেন, 'বাবা আলিফ, আমার সাথে ভাত খাও, আসো'। সে ভাত খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। আনুমানিক সকাল ৯:৩০ মিনিটের দিকে আলিফ বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। বাসা থেকে বের হয়ে আলিফ তার অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। এদিকে সারা দেশ থেকে মুক্তিকামী মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে ক্রমেই গণভবনের দিকে এগিয়ে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় স্বৈরাচার সরকার। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে আনন্দ মিছিল বের হয়। যশোরের সাধারণ জনতার সাথে এ মিছিলে মেহেদী হাসান আলিফও অংশ নেয়। মিছিল নিয়ে চিত্রার মোড় জাবির হোটেল অতিক্রম করার সময় সেখানে অগ্নিকাণ্ড দেখতে পায়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেকে ভিতরে আটকা পড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের সাথে আলিফও আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে যায়। উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই হোটেলের ভিতরে আটকা পড়ে। আর বের হতে পারে না। দগ্ধ হয়ে প্রাণ যায় আলিফের।

এদিকে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেলেও ছেলে ঘরে ফিরে না। অপেক্ষা করতে করতে আলিফের বাবা ও মা টিভিতে খবর দেখে জানতে পারেন জাবির হোটেলের অগ্নিকাণ্ডের কথা। বিকেল হয়ে গেলেও ছেলে ফিরে না বাসায়। মা চিন্তিত হয়ে খোঁজখবর নিতে থাকেন। এলাকারই আরেক পরিবার মাহিরের মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, তার ছেলেও বাড়ি ফেরেনি। প্রতিবেশির নিখোঁজের খবর শুনে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েন সকলে। ছেলের খোঁজে সদর হাসপাতালে যান। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তারা আলিফকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পান। শরীরের অধিকাংশ অংশ পুড়ে যাওয়ায় তাকে চেনা যাচ্ছিল না। এরপর শহিদ আলিফকে চাঁচড়া রাজবাড়ী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেহেদী হাসান আলিফের বাবা মো. হারুন অর রশীদ পেশায় একজন ড্রাইভার। তার মা মোমেনা বেগম ডলি। আলিফের একটি ছোটো বোন আছে, তার নাম মীম। মীম স্থানীয় একটি স্কুলে ১ম শ্রেণিতে পড়ে। আলিফের স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: চাঁচড়া আদর্শ পাড়া; ৫নং ওয়ার্ড; থানা: সদর থানা; জেলা: যশোর।



মো. ইউসুপ আলী

গেজেট নং: ১১০

আইডি: খুলনা বিভাগ ০৮

মো. ইউসুপ আলী এক উদ্যমী ও প্রতিশ্রুতিশীল কিশোর, যে ছোটোবেলাতেই শিক্ষা ও ধার্মিকতাকে আলিঙ্গন করেছিল। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করার পর যশোর রেলওয়ে স্টেশন মাদ্রাসায় হিফজ কোর্সে ভর্তি হয় সে। তার নয় পারা কোরান মুখস্ত ছিল। ইউসুপের জন্ম ৩রা এপ্রিল ২০০৯ সালে, যশোরের এক শান্ত ও সরল গ্রাম চাঁচড়া ডালমিলে। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে স্বৈরাচার সরকার। এদিন জনতার উল্লাসে ভরে ওঠে শহরের প্রতিটি প্রান্ত। এই মিছিলে শামিল হয়েছিল যশোর রেলস্টেশন মাদ্রাসার কিশোর ইউসুপ আলীও। ৫ই আগস্ট ইউসুপ আলী নতুন জামাকাপড় পরে, ভাইয়ের কিনে দেওয়া নতুন জুতা পায়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস আর আশায় ভরা হৃদয় নিয়ে মিছিলে বের হয়। ঘর থেকে বেরোনোর আগে মায়ের কাছে এসে বলে, 'আম্মু, মিছিলে যাচ্ছি। তিনটার মধ্যে ফিরে আসব।' আনুমানিক দুপুর দুইটার দিকে চাঁচড়া চেকপোস্টে ইউসুপের সাথে তার মেজো ভাই ইয়াসিনের দেখা হয়। বিজয় মিছিলের ভিড়ে তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা বলে। এই কথাই ছিল দুই ভাইয়ের শেষ কথোপকথন। এরপর সেই মিছিলের উত্তাল ভিড়ে ইউসুপ যেন হারিয়ে যায়।

বিকেলের দিকে ইউসুপের পরিবারের কাছে আসে মর্মান্তিক এক সংবাদ- জাবির হোটেলে আগুন লেগেছে এবং সেখানে তিনজন ছেলে নিখোঁজ। উৎকণ্ঠায় ছুটে যায় ইউসুপের পরিবার, তাকে খুঁজতে শুরু করে জাবির হোটেল সংলগ্ন এলাকা এবং হাসপাতালগুলোতে। কিন্তু কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। রাত আটটার দিকে তারা জানতে পারে, যশোর সদর হাসপাতালে বেশ কিছু মৃতদেহ আনা হয়েছে। শঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় সেখানে ছুটে যায় ইউসুপের পরিবার। আগুনে পোড়ার কারণে ইউসুপকে প্রথমে চেনা যাচ্ছিল না। তবুও তার ভাই ইয়াসিন যে কিছুদিন আগে তাকে নতুন জুতো কিনে দিয়েছিল, সেই জুতো দেখে ভাইকে শনাক্ত করতে পারে। ইউসুপ হোসেনের বাবা মো. মানিক হোসেন ড্রাইভার, মা শাহিনা আকতার গৃহিণী। তাদের স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- চাঁচড়া ডালমিল, ইউনিয়ন- ৫নং ওয়ার্ড, থানা- সদর, জেলা যশোর।



মো. আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিম

গেজেট নং: ৪৪

আইডি: খুলনা বিভাগ ৩০

মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান মো. আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিম। সে কুষ্টিয়া জেলার ২৬ পুরাতন বাধ সদর থানার চড় থানাপাড়া গ্রামে ২৩শে ডিসেম্বর ২০১১ সালে জন্মগ্রহণ করে। কুষ্টিয়াতেই বড়ো হয় সে। ৬নং পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল মুস্তাকিম। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে ৪র্থ শ্রেণির পর তার পড়াশোনা থেমে যায়। এর আগে কিছুদিন মাদ্রাসায়ও অধ্যয়ন করেছিল সে। বাবাকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য স্যানেটারির কাজ শুরু করে। জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঢাকা থেকে শুরু হলেও দ্রুতই সারাদেশে তা ছড়িয়ে যায়। ৫ই আগস্ট গণভবনমুখী কর্মসূচি সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এই খবরে কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা শহরের মজমপুর গেটে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা কুষ্টিয়া মডেল থানা ঘিরে ফেলে। ঘটনার দিন ৫ই আগস্ট সকালে মুস্তাকিম অসুস্থ বাবার জন্য খাবার নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে ফিরে ছাত্র-জনতার ভিড়ে মিশে যায়। এসময় বিজিবি ও সেনা সদস্যরা পুলিশ ও জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশকে নিরস্ত্র হতে এবং গুলি ছোড়া থেকে বিরত থাকার আহবান জানায়। কিন্তু তার আগেই স্বৈরাচার সরকারের বাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ে নিরস্ত্র কিশোর মুস্তাকিম। এ সময় আরো কয়েকজন গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেনা ও বিজিবি কর্মকর্তারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

বাবা মো. লোকমান হোসেন বাবুর্চির কাজ করত এবং ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনের সড়কের পাশে বাবার চায়ের দোকান ছিল। তবে অসুস্থতার কারণে তিনি এখন কর্মহীন। তার মা হ্যাপি বেগম। নানান টানাপোড়েনের মধ্যেই চলত তাদের সংসার। আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিম থাকত মা-বাবার সাথে চড় থানাপাড়াতে। কিশোর মুস্তাকিম স্যানিটারি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে পরিবারের খরচ চালাতো। তার মৃত্যুতে পুরো পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। মুস্তাকিমের বাবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে আর কেউই রইল না। তিন বোনের অতি আদরের ভাই মুস্তাকিম। মুস্তাকিমের তিন বোনই বিবাহিত।



মো. উসামা

গেজেট নং: ৪৮

আইডি: খুলনা বিভাগ ৩২

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী সৈনিক ছিল মো. উসামা। উসামা ৩রা এপ্রিল ২০০৮ সালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা কুষ্টিয়া সদর থানাধীন দহকুলা গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। অত্যন্ত সৎ, দ্বীনদার ও পরোপকারী ছিল সে। লেখাপড়ায়ও ছিল খুবই মেধাবী। সবেমাত্র দাখিল পাস করে কোয়াতুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। লেখাপড়ায় জীবনের প্রতিটি স্তরে সে মেধার স্বাক্ষর রাখে। ছোটোবেলা থেকে সে এলাকার সামাজিক কাজগুলো নিজে দায়িত্ব নিয়ে করত। সে কুষ্টিয়ার একটি ব্লাড ব্যাংকের সদস্য ছিল। এলাকায় কারো ব্লাডের প্রয়োজন হলেও ব্যবস্থা করে দিত। পারিবারিক কাজেও বাবা-মাকে সহযোগিতা করত। একবার তার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রায় দুই থেকে তিন মাস নিজে রান্না করে পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে।

শহিদ উসামা প্রথম থেকেই ছাত্র-অন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের দিন ৫ই আগস্ট ২০২৪ উসামা বাসা থেকে বেলা বারোটার দিকে বের হয়ে কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে আন্দোলনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগদান করে। ওখান থেকে ছাত্র-জনতার মিছিল এন. এস রোডে পৌঁছালে সরকারের বাহিনী এবং সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। দুঃসাহসী বীর উসামা গুলির ভয় উপেক্ষা করে মুজিব চত্বরে পৌঁছালে টার্গেটকৃত গুলি উসামার পিঠে লাগে। মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ে সে। জনতা তাকে উদ্ধার করে মোটরসাইকেলে আদ-দ্বীন হাসাপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার উসামাকে শহিদ ঘোষণা করেন। এরপর উসামার নামের সাথে যুক্ত হয় শহিদ শব্দটি।

বাবা জয়নুল আবেদীন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। মা রাবিয়া খাতুন একজন গৃহিণী। তার স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: দহকুলা; ইউনিয়ন: আলমপুর; থানা: কুষ্টিয়া সদর; জেলা: কুষ্টিয়া। উসামা চার ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় ছিল। বড়ো বোন সুমাইয়া খাতুন বিবাহিত। বড়ো ভাই মাহমুদুল হাসান একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। আর ছোটো ভাই খালিদ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে।

মো. মাহিম হোসেন

গেজেট নং: ৫৬৪

আইডি: খুলনা বিভাগ ৩৬



কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের বামন পাড়া গ্রামে মো. মাহিম হোসেন ৩০শে অক্টোবর ২০০৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। চাঁদট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র মাহিম ছোটোবেলা থেকেই অনেক মেধাবী ছিল। সে ফুটবল খেলায় বেশ পারদর্শী ছিল। পরিবারের বড়ো হওয়ায় সে চাচা, ফুফু সবার আদরের বড়ো সন্তান ছিল। তাকে ঘিরে বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। সে বড়ো হয়ে চাকরি করবে আর তাদের দুঃখের দিন ঘুঁচবে। কিন্তু এক নিমিষেই পরিবারের সব আশা শেষ হয়ে যায়। দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। জুলাই ২০২৪-এ সংগঠিত ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন এক সময় রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে।

সারা দেশের মতো কুষ্টিয়ায়ও স্বৈরাচারী সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে ফুঁসে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা খালি হাতে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই আন্দোলনে মাহিমও দলবল নিয়ে অংশগ্রহণ করে; বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে নেতৃত্ব দিতে থাকে।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকার ৫ই আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ওই দিন আন্দোলনে যাওয়ার সময় তার মা তাকে আন্দোলনে যেতে বার বার নিষেধ করেছিলেন। মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে মাহিম বলেছিল, 'স্কুলের সবাই যাচ্ছে, আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি? আমি প্রয়োজনে শহিদ হব'। একথা বলে সে মিছিলে যোগ দিতে উপজেলা সদরে চলে যায়। পথিমধ্যে মাহিম ও তার দল পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। সেখানে বন্ধুদের রেখে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে বাসে উঠে। পাশের উপজেলা কুমারখালীতে গিয়ে বাস থেকে নেমে সেখানেই আন্দোলনে যোগ দেয়। এসময় সে পুলিশের ছোড়া মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে পড়ে যায়। অকস্মাৎ এমন পরিস্থিতিতে মাহিম গুরুতর আহত হয়। এ পরিস্থিতিতে গুরুতর আহত মাহিমকে উদ্ধার করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে স্থানীয় কয়েকজন নারী তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নিরাপদে বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু বাড়িতে আসার পর তার শরীর ও মুখের জ্বালা যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকে। ১৭ই আগস্ট সকাল থেকে প্রচণ্ড জ্বর ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয় মাহিম। ১৯ তারিখ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন সকাল ৭.০০ টায় মারা যায় মাহিম।

মাহিম হোসেনের বাবা মো. ইব্রাহিম টাইলস মিস্ত্রীর কাজ করেন, মা মোসা. রেহেনা খাতুন একজন গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বামন পাড়া, ইউনিয়ন: বেতবাড়িয়া, থানা: খোকসা, জেলা: কুষ্টিয়া। মাহিমের আরো দুই ভাই আছে। এক ভাই নাঈম, বামন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আর এক ভাই নিয়ামুল, একই বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী।



আরিকা আজিজ ফারিন, চতুর্থ শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



হিমাদ্রী দে, চতুর্থ শ্রেণি, লিটল জুয়েলস নার্সারী ইনফেন্ট এন্ড জুনিয়র স্কুল, ঢাকা

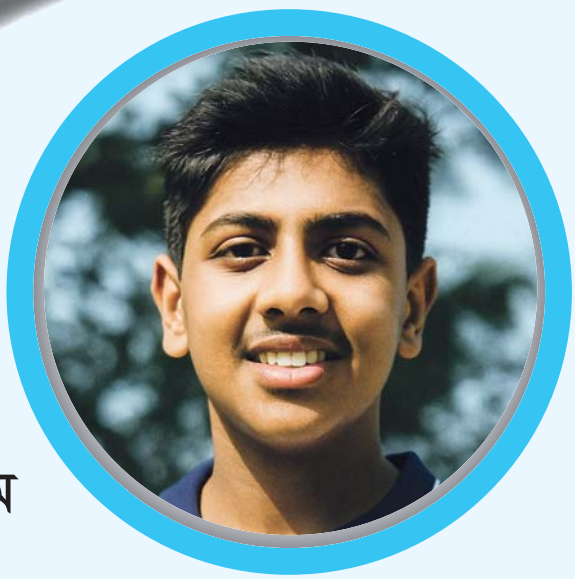

আলিফ আহমেদ সিয়াম

গেজেট নং: ৩২৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ৪১

বাগেরহাট সদর থানার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ২০০৯ সালের ৩১শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করে আলিফ আহমেদ সিয়াম। সে সাভারে ডেইরীফার্ম হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পাইলট হওয়ার এবং এভিয়েশন সেক্টরে যোগদানের স্বপ্ন ছিল তার। আলিফ খুব সাদাসিধা ও সহজসরল শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ভাইদের সাথেও ছিল তার অসাধারণ সম্পর্ক। প্রথম যেদিন সে শুনতে পেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ভাইয়েরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সেদিন থেকেই সে আন্দোলনে যাওয়া শুরু করে। আলিফের মা নিষেধ করলেও তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সাহস যোগাতেন। একদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে গিয়ে আলিফের হাতে রাবার বুলেট ও চোখে টিয়ারশেলের গ্যাস লাগে। এই অবস্থা দেখে মা পরবর্তীতে আর আন্দোলনে যেতে দিচ্ছিলেন না তাকে। এরপর ৫ই আগস্ট লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ঘোষণা আসলে আলিফের মা আর তাকে ধরে রাখতে পারেননি। আলিফের বন্ধুরা তাদের বাসায় এলে 'খুব বেশি দূরে যাবে না' -এই বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আলিফ। যাওয়ার সময় আলিফের মা একটা মুঠো ফোন দিয়ে দেন। ১১টার দিকে মায়ের সাথে আলিফের কথাও হয়। ১২টা ১০ এর দিকে ফোন দিলে আলিফ মাকে বলে, 'মা আমরা গণভবনের দিকে যাচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না। ইনশাআল্লাহ আমার কিছু হবে না, যদি আমার কিছু হয়ও আমি শহিদ হব আর তুমি শহিদের মা হবে'। মা বললেন, 'আমি শহিদের মা হতে চাই না। তুমি এখনই বাসায় চলে আসো বাবা'। তখন আলিফ বলে- 'তুমি দোয়া করো মা, আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি সেই উদ্দেশ্য যেন সফল হয় এবং বিজয়ের বেশে তোমার কাছে ফেরত আসতে পারি'। আর কিছু না বলে ফোন রেখে দেয়। কিছুক্ষণ পর সাভারে গোলাগুলি শুরু হলে আলিফের মা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ২ টা ৩০ এর দিকে আলিফের মায়ের কাছে একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসে যে আলিফ আহত হয়েছে। আহত আলিফকে ল্যাবজন হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এনাম মেডিকেলে আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় টানা দুই দিন। অতঃপর ৭ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় শাহাদত বরণ করে আলিফ আহমেদ সিয়াম।

সিয়ামের বাবা বুলবুল আহমেদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি কাপড়ের দোকান চালান। আলিফ আহমেদ সিয়াম বাবাকে এ ব্যাবসায় সহায়তা করত। মা তানিয়া আহমেদ একজন গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- বড়ো বাঁশবাড়িয়া, পো. কাশিমপুর বাজার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।



ইয়াসিন শেখ

গেজেট নং: ৭২৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ৪৩

খুলনা জেলার রহিম নগরে ১৬ই অক্টোবর ২০০৮ সালে হতদরিদ্র মাতা-পিতার ঘরে আলো হয়ে আসে ছেলে ইয়াসিন শেখ। জন্মের পরেই তার বাবা মারা যান। বড়ো তিন বোনের আদরের একমাত্র ভাই ইয়াসিন। মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে বড়ো হয়ে সংসারের হাল ধরবে। ছোটো থেকেই লেখাপড়ায় ভালো ছিল সে, সাথে ছিল দুরন্তপনা। চঞ্চল হলেও ছোটোবেলা থেকেই কোনো বিবেক বর্জিত কাজে যুক্ত হতো না। মানবিক সকল কাজে সাহায্য ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রতিবেশীদের খোঁজখবরও রাখত নিয়মিত। অমায়িক ব্যবহার ছিল তার। ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকার একটি এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে ডেলিভারি ম্যানের কাজ করত।

জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন পরিণত হয় বৈষম্যবিরোধী গণ-আন্দোলনে। ১৯শে জুলাই ২০২৪ শুক্রবার, ছিল পবিত্র জুম্মার দিন। যাত্রাবাড়ি এলাকা সকাল থেকেই ছিল থমথমে। নামাজের আগ পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। পবিত্র জুম্মার নামাজ আদায় করে আপামর ছাত্র-জনতা একযোগে রাজপথে নেমে আসে। জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা প্রদান ও অতর্কিত হামলা চালায় পুলিশ বাহিনী ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তাদের এলোপাতাড়ি গুলিতে বড়ো হতে থাকে শহিদদের মিছিল।

নামাজের পর গ্রাহকের বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দোকানে ফেরার সময় ইয়াসিন যাত্রাবাড়িতে ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার মাঝে পড়ে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে সন্ত্রাসীদের ছোড়া বুলেট আঘাত করে ইয়াসিনকে। আহত অবস্থায় তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৫শে জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় শাহাদত বরণ করে ইয়াসিন।

ইয়াসিনের বাবা নূর ইসলাম শেখ। মা মনজিলা বেগম অন্যের বাড়ি কাজ করেন। ইয়াসিন ছাড়াও তার আরও তিন বোন রয়েছে। মায়ের আয় দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলে। মায়ের এমন কষ্ট দেখে ইয়াসিন শেখ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঢাকায় গিয়ে কিছু করে মাকে সাহায্য করবে। ইয়াসিন শেখের স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- রহিমনগর; ইউনিয়ন- ৩নং নৈহাটি; থানা- রূপসা; জেলা- খুলনা।



আহাদ আলী বিশ্বাস

গেজেট নং: ৩৬৬

আইডি: খুলনা বিভাগ ৫৩

কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই এই দাবির সাথে সাধারণ জনতা একত্রিত হতে থাকে। অনেক শিশু-কিশোর এই আন্দোলনে শহিদ হয়। এমনই একজন বিদ্রোহী কিশোর আহাদ আলী বিশ্বাস। আহাদের জন্ম ৭ই আগস্ট ২০০৭ সালে। আহাদ আলী মোহাম্মদপুরের আমিনুর রহমান ডিগ্রি কলেজের মানবিক বিভাগের প্রথম বর্ষের একজন নিয়মিত ছাত্র ছিল।

এক সময় বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলন সকলের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতার স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য আহাদ আলী বন্ধুদের উৎসাহ দিত এবং প্রতিদিন কলেজে গিয়ে কখন কীভাবে মিছিলে যোগ দিতে হবে সেই বিষয়ে সকলকে একত্রিত করে উদ্বুদ্ধ করত।

৪ঠা আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় আহাদ তার সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে কলেজের সামনের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল থেকে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ ৪জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হয়। চতুর্দিক থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা এসে মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলকারীরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য থানা পুলিশকে বার বার অনুরোধ করে কিন্তু পুলিশ তাদের না ছেড়ে বরং ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর টিয়ারশেল ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে অনেক ছাত্র-জনতা মারাত্মক আহত হয়।

জনতার প্রতিরোধের এক পর্যায়ে পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে সাধারণ জনতা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। আহতদের মধ্যে আহাদ আলীও ছিল। দুপুর ১টায় চিকিৎসারত অবস্থায় আহত আহাদ আলী শাহাদত বরণ করে।

শহিদ আহাদ আলীর পিতা ইউনুস বিশ্বাস একজন ভ্যানচালক এবং মাতা মোছা. পাখি খাতুন গৃহিণী। ছোটো ভাই মো. ইসলাম আলী মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম, থানা, উপজেলা- মহম্মদপুর, জেলা- মাগুরা।



মাহাফুজুর রহমান

গেজেট নং: ৬৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ৫৯

চার সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো এবং আদরের ছিল মাহাফুজুর রহমান। বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলার নিশান বাড়িয়া ইউনিয়নের হরতকিতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে মাহাফুজ।

মাহাফুজকে নিয়ে পরিবারের অনেক স্বপ্ন ছিল। আশা ছিল বড়ো হয়ে একদিন সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে এবং মা-বাবার দুঃখ ঘুচবে। তবে সেই স্বপ্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতেই শেষ হয়ে গেছে।

১৯শে জুলাই ২০২৪ মিরপুরের ১০ নম্বর গোলচত্বরের রাস্তায় জুম্মার নামাজের পর মিছিলে নেমেছিল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহাফুজুর রহমান। সেদিন শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যে হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। বিকেল ৪টার দিকে একটা গুলি এসে লাগে মাহাফুজুরের মাথায়। সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং সেখানেই শহিদ হয় ১৫ বছরের এই কিশোর।

নামাজের পরও যখন মাহাফুজ ফেরে না, তখন বাবা, দুলাভাই আর কয়েকজন সহপাঠী মিলে মিরপুর-১০ নম্বরে মাহাফুজুরকে খুঁজতে বের হন। তখনই একজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে পারেন বিকেল ৪টার দিকে মাহাফুজুরের গুলি লেগেছে। উদভ্রান্তের মতো সেদিন সারারাত আর পরদিন বিভিন্ন হাসপাতালে ছেলের খোঁজ করেন স্বজনেরা।

২০শে জুলাই সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জানতে পারেন তার আদরের ছেলে আর নেই। শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গের একজন সহকারী মান্নানের মোবাইল ফোনে একটি ছবি দেখে মাহাফুজুরকে শনাক্ত করেন। জানান যে তার ছেলের লাশ মর্গে আছে। মান্নান ছেলের লাশ ফেরত চেয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় যান। পুলিশ এই শর্তে লাশ দেবে বলে জানায় যে, লাশ দাফনের জন্য সরাসরি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে তাদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে, অন্য কোথাও নেওয়া যাবে না। জানাজার জন্য শিক্ষার্থীরা এরপর মাহাফুজুরের লাশ স্কুল মাঠে নিলে অনেক অনুরোধের পর অল্প সময়ের জন্য জানাজার সুযোগ পায়। এরপর মধ্যরাতে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয় মাহাফুজুরের লাশ। শহিদ মাহাফুজুর রহমান তার পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান, তার আরও বড়ো তিন বোন রয়েছে। তার বাবা আব্দুল মান্নান রিকশাচালক। মা মোসাম্মদ বেগম একজন গৃহিণী।

চট্টগ্রাম বিভাগ

মো. জিহাদ হাসান

গেজেট নং: ৮৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭



কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল কলেজ শিক্ষার্থী মো. জিহাদ হাসান। আন্দোলন যখন এক দফায় গড়ায় তখন যাত্রাবাড়ি এলাকায় চলছিল টানা সহিংসতা-সংঘাত। ভয় থেকে জিহাদের মা ছেলেকে নিষেধ করেছিলেন আন্দোলনে যেতে। জিহাদ বলেছিল, মা আর একদিন মাত্র আন্দোলনে যাব। কিন্তু এরপর আর ঘরে ফিরতে পারেনি সে। মো. জিহাদ হাসানের জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে যাত্রাবাড়ি এলাকায়। রাজধানীর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল জিহাদ হাসান। কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হয়ে জিহাদ বলেছিল, ভবিষ্যতে সে চাকরি করবে না, ব্যাবসা করবে। বন্ধুদের কাছে সে বলত, আব্বুর বয়স হচ্ছে, তাকে বেশিদিন চাকরি করতে দেবো না। শিগগিরই আমার কিছু করতে হবে। ১৯শে জুলাই আন্দোলনে গিয়ে সে ছররা গুলিতে আহত হওয়ায় মা ছেলেকে হারানোর ভয়ে আন্দোলনে যেতে আবারো নিষেধ করেন। ৫ই আগস্ট সকালে ডিম সেদ্ধ করতে বলে মাকে না জানিয়েই লুকিয়ে মোবাইল বাসায় রেখে এবং নাশতা না খেয়েই বাসা থেকে বেরিয়ে যায় জিহাদ। দুপুরের পর মানুষের বিজয় মিছিলে আনন্দ আর হই-হুল্লোড় শুরু হলে বাসা থেকে সবাই মনে করে সেও বন্ধুদের সঙ্গে হয়ত আনন্দ-উল্লাসে মেতেছে। কিন্তু মোবাইল ফোন বাসায় রেখে যাওয়ায় তার সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সকাল আনুমানিক সাড়ে এগারোটার দিকে যাত্রাবাড়ি থানার পাশে থেকে ছাত্র-জনতা কারফিউ ভেঙে শাহবাগের দিকে রওনা দিলে পুলিশ বাহিনী সরাসরি গুলিবর্ষণ শুরু করে। তখন একটি বুলেট এসে কপালে বিদ্ধ হয় শহিদ জিহাদের। ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করে জিহাদ। যাত্রাবাড়ি থানার কাছে গুলিবিদ্ধ জিহাদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় শান্ত, নোমান, মনিরসহ তরুণ বয়সের কয়েকজন। শহিদ নিশ্চিত হওয়ার পর জিহাদকে তারা নিয়ে যায় দনিয়া জামে মসজিদে। তখনো তার পরিচয় অজ্ঞাত। জিহাদের মরদেহের ছবি তুলে রাত ১০টার দিকে কেউ এক ফেসবুক পেইজে পোস্ট দেয়। পরে একজন চিনতে পেরে কল দিয়ে জিহাদের পরিবারকে জানায় সেই পোস্টের ব্যাপারে। শহিদ হওয়ার দুই দিন আগে ফেসবুকের এক স্ট্যাটাসে জিহাদ লিখেছিল, 'বক্তব্য একটাই। হয় দেশের কাফনের কাপড় শেষ হবে, অথবা মিষ্টির দোকান খালি হবে'। মা-বাবা আদর করে ছেলের নাম রেখেছিল জিহাদ। কে জানত এই ছেলে বিপ্লবী হবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ দেবে।

জিহাদের বাবা মো. আলম মিয়া স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। মা মোসা. কোহিনুর বেগম গৃহিণী। তিন ভাইবোনের মধ্যে জিহাদ দ্বিতীয়। ছোটো ভাই তাহমিম হাসান যাত্রাবাড়ি এলাকার বর্ণমালা আদর্শ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। বড়ো বোন রাজধানীর বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ঢাকারগাঁও, পো. হাসানপুর, উপজেলা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা।



মো. রিফাত হোসেন

গেজেট নং: ১২৭

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় সুকিপুর গ্রামে ২০০৯ সালের ১০ই মে জন্ম নেয় রিফাত হোসেন। রিফাত জন্মের পর পরই বাসচালক বাবাকে হারায়। রিফাতরা দুই ভাইবোন খুব কাছ থেকে জীবনের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে নানাবাড়িতে বড়ো হয়েছে। এত সংকটের মধ্যেও স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে রিফাত। কোরানের ১৭ পারা তার মুখস্থ ছিল, সে নিয়মিত নামাজ আদায় করত। তবে এরপর আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশুনা বন্ধ করে মুন্সিগঞ্জে কাজ শুরু করে। ২০২৪-এর জুলাই মাস পর্যন্ত সেখানে বেকারিতে কাজ করে। পড়ে কাজটি ছেড়ে বোনের বাড়িতে থেকে ভগ্নিপতি সাইদুলের কাছে পাইপ সংযোগের কাজ শিখছিল।

৪ঠা আগস্ট সকালে রিফাত কাজে না গিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় তাকে আন্দোলনে যেতে একাধিকবার নিষেধ করা হয়। তার বোন বলেছিল, 'তোর কিছু হলে আমি কী করে বাঁচব?' জবাবে রিফাত হাসিমুখে বলেছিল, 'আমার কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ, দেশ স্বাধীন করে আবার ঘরে ফিরব'। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এক দফা দাবিতে ওইদিন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার শহিদ নগরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিছিলে শামিল ছিল রিফাত। আন্দোলনরত অবস্থায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জনতার উপর গুলি ছুড়লে রিফাত আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে তারা রোগীকে রাখতে অস্বীকার করে। এরপরে তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও কোনো চিকিৎসা না দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে হাসপাতালে রাখতে অস্বীকার করে এবং বলে রোগীর অবস্থা ভালো। হাসপাতালে রাখলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। ফলে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বিনা চিকিৎসায় এরপর ৪ঠা আগস্ট রাতে নিজ বাড়িতে রিফাত শাহাদত বরণ করে। রিফাতের বাবার নাম হানিফ মিয়া। মায়ের নাম রিপা আক্তার।

সাহাদাত হোসেন

গেজেট নং: ৩৯৪

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৪০

সাহাদাত হোসেন এমনই একজন মানুষ ছিল যে কিনা ছোটোবেলা থেকেই অনেক কষ্ট করে বেড়ে ওঠে। ২০০৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি জন্ম হয় সাহাদাত হোসেনের। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে বড়ো। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা গ্রামে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। অভাবের সংসারে জীবিকার তাগিদে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করত। সে খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিল ও নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত।

আগস্টের ৫ তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পর যখন পুরো দেশ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে, তখন সে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের আনন্দ দেখছিল। আনন্দে উন্মত্ত জনগণ থানার সামনে গেলে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে সবার ওপর গুলি চালায়। বিজয়ের পরেও পুলিশ বাহিনী এভাবে গুলি করবে ভাবেনি কেউ। পুলিশ যখন সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছিল হঠাৎ একটা বুলেট এসে বিদ্ধ হয় সাহাদাতের কপালে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই সে শাহাদত বরণ করে।

সাহাদাতের বাবা খলিলুর রহমান ও মা শিরতাজ। পারিবারিক সমস্যার কারণে নানা-নানির কাছেই বড়ো হয়েছিল সে। তার নানা কৃষিকাজ করেন। পরিবার বলতে এই নানা-নানিই ছিল তার কাছে প্রধান। অভাবের কারণে সাহাদাতের ছোটো ভাইকে দত্তক দিয়েছিল নানি।



নাঈমা সুলতানা

গেজেট নং: ২৩৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৪১

চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানার সুলতানাবাদ ইউনিয়নের আমুয়াকান্দা গ্রামে ২৫শে জুলাই ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে নাঈমা সুলতানা। গ্রাম থেকে ৭ম শ্রেণির পাঠ চুকিয়ে ২০২২ সালে এক বুক স্বপ্ন ধারণ করে এরপর মায়ের সাথে পাড়ি জমায় ঢাকায়। মাইলস্টোন স্কুলে ভর্তি হয় নাঈমা সুলতানা। শাহাদত বরণের সময় বিজ্ঞান বিভাগের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল সে। নাঈমা সুলতানা ছোটোবেলা থেকে তীক্ষ্ম মেধাবী ছিল। বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল সে।

সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে জুলাই ২০২৪-এর আন্দোলনে নামে সারাদেশের ছাত্ররা। ছাত্রদের ন্যায্য দাবির কোনো সমঝোতা না করে তৎকালীন সরকার ছাত্রদের আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে হত্যা করে। নাঈমা শাহাদত বরণের আগের দিনও সহপাঠীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সে ছিল অঙ্কনশিল্পী। ডায়েরিতে সে আন্দোলনের দাবিদাওয়া নিয়ে একটি পোস্টার আঁকে, যেখানে লেখা ছিল বিভিন্ন স্লোগান। নাঈমা এই পোস্টার তার ফেসবুক ওয়ালে দিয়ে সেখানে লেখে, 'আন্দোলন হবে এবার রংতুলিতে, কোটা প্রথা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক'।

১৯শে জুলাই ২০২৪ দিনটি ছিল জুম্মাবার। ছাত্রদের দ্বিতীয় দিনের মতো কমপ্লিট শাটডাউন চলছিল। সরকার সারা দেশে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট করে পৃথিবী থেকে পুরো বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। উত্তরায় জুম্মার নামাজের পর ছাত্র-জনতা মিছিল বের করলে মিছিলে পুলিশ সরাসরি গুলি চালায়। আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে উত্তরার বিভিন্ন সেক্টরের অলিতে-গলিতে ঢুকে পড়ে। উত্তরা ৯ নং সেক্টরের ৫ নং রোডের ১৫ নং বাসায় থাকে নাঈমা সুলতানার পরিবার। নাঈমা তখন বাসায় বিশ্রাম করছিল। বাইরে হট্টগোল শুনে বেলকনিতে আসে দেখার জন্য। নিজ চোখে দেখছিল পুলিশের আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করার দৃশ্য। তখনো সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, কয়েক সেকেন্ড পরেই বুলেট তার কপালে বিদ্ধ হবে। কোনোকিছু বুঝে উঠার আগেই একটি গুলি এসে লাগে তার মাথায়। বেলকনিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তার এই অবস্থা দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে যায় উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে। নেওয়া হয় আইসিইউতে। কিছুক্ষণ পরেই খবর এল নাঈমা সুলতানা শাহাদত বরণ করেছে।

নাঈমার বাবা গোলাম মোস্তফা পেশায় একজন জনপ্রিয় হোমিও চিকিৎসক ও মা আইনুন নাহার গৃহিণী । চাঁদপুর মতলব দক্ষিণ নারায়ণপুর বাজারে নিয়মিত রোগীদের সেবা দিয়ে থাকেন গোলাম মোস্তফা। তিনি তার সন্তানদের নিয়ে তাদের পড়াশোনার সুবিধার্থে উত্তরা ৯ নং সেক্টরের একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। নাঈমারা দুই বোন এক ভাই। বড়ো বোন তাসফিদ এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। ছোটো ভাই ২য় শ্রেণিতে পড়ত।



ফারিয়া আক্তার, চতুর্থ শ্রেণি, পিপড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নকলা, শেরপুর



জাবিয়া তাসনীম সূচনা, ষষ্ঠ শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



আশিকুর রহমান

গেজেট নং : ৮২২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৮

আশিকুর রহমান একটি নাম, একটি সংগ্রামের প্রতীক এবং একটি হৃদয়বিদারক ইতিহাসের অংশ। ১৪ই জুলাই ২০০৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার গকুল নগরে জন্মগ্রহণ করে আশিকুর। ছোট্ট গ্রাম, মেঠো পথ, সবুজ মাঠ আর দুরন্ত শৈশব ঘিরে ছিল তার জীবন। অভাবের তাড়নায় কৈশোরেই তার কাঁধে ভর করে পরিবারের ভার। কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করলেও তার হৃদয়ের গভীরে ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার। দেশের মানুষ যখন নির্যাতিত, ছাত্ররা যখন রাস্তায় নামে অবিচারের বিরুদ্ধে, আশিকুরও তাতে শামিল হয়। তার কাজ কিংবা দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম তাকে থামাতে পারেনি। প্রতিদিনের কষ্টসাধ্য জীবনেও সে অবিচল ছিল একটি আদর্শ দেশের জন্য, মানুষের জন্য। কিন্তু সেই সংগ্রামের এক পর্যায়ে তার জীবন থেমে গেল। ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট কাঁচপুর ব্রিজের কাছে পুলিশ যখন নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে তখন আশিকুরও সেই আক্রমণের শিকার হয়। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে পুলিশের ছোড়া বুলেট তার শরীরে বিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে আশিকুরকে বাঁচানো যায়নি। ৫ই আগস্ট সকাল ১০টায় সে শাহাদত বরণ করে।

আশিকুর রহমানের বাবার নাম কামাল মিয়া। তিনিও বেঁচে নেই। মা কুসুম বেগম গৃহিণী। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫জন।



মোহাম্মদ ইসমামুল হক

গেজেট নং : ১৬৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৫৩

মোহাম্মদ ইসমামুল হক ২০০৭ সালের ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার আমীরাবাদ ইউনিয়নের দর্জিপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তিন ভাইয়ের মধ্যে ইসমামুল ছিল মেজো। অভাবের সংসারে বড়ো হওয়ায় ইসমামুলকে ছোটোবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই সংসারের হাল ধরতে ঢাকায় এসে একটি কসমেটিকসের দোকানে চাকরি নেয় সে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই ২০২৪ জুড়ে। সারাদেশে পুলিশ গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়ে ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। ইসমামুল এসব দেখে চুপ করে বসে থাকেনি। সে শুরু থেকে আন্দোলনে সক্রিয় ছিল।

৪ঠা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় ছাত্র-জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে 'লং মার্চ টু ঢাকা'। এরই জের ধরে ৫ই আগস্ট দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হয়। সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য ৫ই আগস্ট খুবই আনন্দের দিন। চারিদিকে আনন্দ মিছিল শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার আনন্দ যে বাধভাঙা তারই স্বাদ নিতে মিছিলে যোগ দেয় ইসমামুল। দোকানের মালিক বার বার নিষেধ করলেও সে তা শুনেনি। মিছিল যখন ঢাকার চানখারপুলে আসে তখন বিকেল ৪:৩০টা বাজে, ওই সময় একদল পুলিশ ও অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডার সেই মিছিলে হামলা করে, হামলায় গুলিতে অনেক মানুষ গুরুতর আহত হয়। তাদেরই একজন ছিল ইসমামুল। সাধারণ জনতা ধরাধরি করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৭ই আগস্ট বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদত বরণ করে ইসমামুল।

তার বাবা মৃত নুরুল হক এবং মা সাহেদা বেগম। অল্প বয়সে বাবা হারিয়ে দুঃখিনী মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় সে। ইসমামুলের আরো ২ ভাই আছে। বড়ো ভাই মহিবুল হক এবং ছোটো ভাই আবু বকর হিফয পড়ছে।



সাদ আল আফনান

গেজেট নং : ৬২১

আইডি: চট্টগ্রাম ০৬১

সাদ আল আফনান একজন স্বপ্নের মূর্ত প্রতীক। ২০০৬ সালের ১০ই নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার খিদিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। ছোটোবেলা থেকেই তার চোখে ছিল আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন। শহিদ সাদ আল আফনান লক্ষ্মীপুর ভিক্টোরিয়া কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। সে ছিল বহুগুণের অধিকারী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী। সদালাপী, বিনয়ী, ভদ্র এবং নম্র এই তরুণের প্রতি সবার হৃদয়ে ছিল বিশেষ এক স্থান। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং বিনয়ের ঢঙে এলাকার সবাই হতো মুগ্ধ। লক্ষ্মীপুর শহরে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ঘিরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সংঘর্ষ হয়, এ সংঘর্ষের শিকার হয় আফনান। ৪ঠা আগস্ট আফনানকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রথমে মাথায় গুলি করে এবং পরে পিটিয়ে হত্যা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নোয়াখালীতে নেওয়ার পথে বেলা তিনটায় তার মৃত্যু হয়।

আফনান শহিদ হওয়ার দুই মাস আগে বাবা সালেহ আহম্মেদ সৌদি আরবে মারা গেলেও এক মাস আগে তাকে দেশে এনে দাফন করা হয়। মায়ের নাম নাসিমা আক্তার তিনি একজন নারী যোদ্ধার মতো। তিনি পিতৃহারা একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কঠিন সময় পার করছিলেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন। ছোটো বোন জান্নাতুল মাওয়া ছাত্রী, বদরুন্নেসা কলেজে পড়ে। বড়ো বোন শারমিন আক্তার অবিবাহিত।



ইউনুছ আলী শাওন

গেজেট নং : ৪৮০

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৬৫

ইউনুছ আলী শাওন লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণ মাগুরী গ্রামে ২০০৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে ছোটোবেলা থেকেই দেখেছে সংসারের সংগ্রামের রূপরেখা। মা-বাবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় ছেড়ে আসে শৈশবের গ্রাম, পা রাখে নারায়াণগঞ্জে। সেখানে এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয় শাওন। ইউনুছের চলাফেরা ছিল এমনই সুন্দর, যা প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে যেত।

২০শে জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তে লেখা এক বর্বরতম দিন। পথে পথে ভিড় জমে উঠেছিল। ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সাধারণ মানুষও নেমে এসেছিল রাজপথে। আর সেই সংগ্রামের মিছিলে দৃঢ় পদক্ষেপে যোগ দিয়েছিল ইউনুছ আলী শাওন। হঠাৎ করেই প্রতিবাদের সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রূপ নেয় বিভীষিকায়। আন্দোলনকারীদের উপর চালানো হয় গুলি। বুলেটের পর বুলেট ছুটতে থাকে নিরীহ ছাত্র-জনতার দিকে। এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বদলে যায়- আকাশে ছড়িয়ে পড়ে কান্না আর আতঙ্ক। জনতার মিছিল ভেঙে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অসংখ্য প্রাণ।

ইউনুছ আলী শাওনও সেই নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে বিদ্ধ হয়। সহকর্মীরা দিশেহারা হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয় আওয়ামী নেতারা সেই মানবিক প্রয়াসেও বাধা দেয়। সব বাধা পেরিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে শাওনকে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও শেষ মুহূর্তে শহিদের খাতায় নাম লেখাতে হয় ইউনুছ আলী শাওনের।

শাওনের বাবা আবুল বাসার পেশায় কৃষক, মা কুলছুম বেগম লাকী গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- দক্ষিণ মাগুরী, ইউনিয়ন- ৯নং উত্তর জয়পুর, থানা- চন্দ্রগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার ছোটো ছিল শাওন।



ইফাত হাসান খন্দকার

গেজেট নং : ৬৩৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৭৯

যাত্রাবাড়ি এ. কে. আইডিয়াল স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী শহিদ ইফাত হাসান খন্দকার ২০০৮ সালের ২০ শে আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। শহিদ ইফাত বয়সে ছোটো হলেও এতটুকু বুঝত যে অন্যায়ের সাথে কখনো আপোশ করা উচিত না। তাই সবাইকে যার যার জায়গা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত। আর তার এই চিন্তাই তাকে ২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করার সাহস জুগিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই যাত্রাবাড়ির কাজলাতে আন্দোলনে যোগ দিত ইফাত। তখন আন্দোলনের প্রধান কয়টি স্পটের মধ্যে যাত্রাবাড়ি ছিল অন্যতম। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হতো। ২০শে জুলাই ২০২৪ দুপুর তিনটার দিকে কাজলায় পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে। হঠাৎ একটি গুলি আন্দোলনরত ইফাতের বুকে এসে লাগলে সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং শাহাদত বরণ করে।

ইফাতের বাবা রবিউল আমিন খন্দকার, মাতা কামরুন্নাহার। তার বাবা বেঁচে নেই। দুই বছর হলো মারা গিয়েছেন। বর্তমানে শহিদ ইফাতের পরিবারে তার মা ও দুজন বোন রয়েছে। ইফাতের বড়ো বোন উম্মে সালমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ছোটো বোন তাজরিয়ানের বয়স মাত্র চার বছর। তার পৈতৃক ঠিকানা: নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে।



মোহাম্মদ সজিব

গেজেট নং : ৫৩৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৮৩

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার রসুলপুর ইউনিয়নের লাউতলী গ্রামে ২০০৬ সালের ১লা অক্টোবর প্রথম সন্তান হিসেবে জন্ম মো. সজিবের। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া সজিবের পড়ালেখা বেশিদূর এগোতে পারেনি। অল্প বয়সেই ধরতে হয়েছে পরিবারের হাল। সজিব নারায়ণগঞ্জের চিটাগং রোডের বিক্রমপুর হার্ডওয়্যারে কাজ করত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন ছাত্র-জনতাকে দমন করার চেষ্টা করে সারাদেশে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব মোতায়েন করে তৎকালীন সরকার। ২০শে জুলাই নারায়ণগঞ্জের চিটাগং রোডে ডাচ বাংলা ব্যাংকের সামনের ঘটনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সজিবও যোগ দেয় মিছিলে। হঠাৎ করেই সেই মিছিলে হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ করা হয় অঝোর ধারায়। ছুটে আসা ২টি বুলেট বিদ্ধ হয় সজিবের গায়ে। জায়গায় লুটিয়ে পড়ে সজিব। কালের সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে রাজপথে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনে তার বন্ধুরা। পরে পরিবারের লোকজন এসে তাকে নিয়ে যায় নিজ বাড়িতে এবং সেখানেই দাফন করা হয় শহিদ সজীবকে।

শহিদ সজিবের বাবা মো. সালা উদ্দিন একজন রিকশাচালক। মা বিবি কুলসুম গৃহিণী। নিজেদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা না থাকায় নানাবাড়িতে থাকত তারা। একমাত্র ছোটো ভাই আশরাফুলের বয়স মাত্র আট। সে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

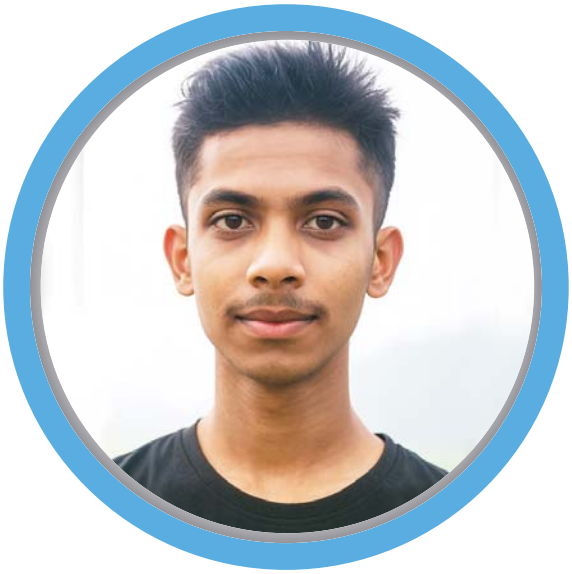

আবদুল কাইয়ুম

গেজেট নং : ৬২৫

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৮৫

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার নরোত্তমপুর গ্রামে আবদুল কাইয়ুম ২০০৭ সালের ১৯শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। চার ভাইবোনের মধ্যে সে সবার ছোটো। মীর কাসেম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে সে। এরপর এসির কাজ শেখার জন্য চলে আসে ঢাকায়। যাত্রাবাড়িতে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সে কাজ শেখা শুরু করে। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেনি। কাইয়ুম কাজ শিখতে গিয়েই ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেয়। শুরু থেকে যাত্রাবাড়ি এলাকা ছাত্রদের আন্দোলনের একটি মজবুত কেন্দ্র ছিল এবং পুরো এলাকা জুড়ে ছিল পুলিশের পাহারা। দফায় দফায় আক্রমণ চালায় ছাত্রদের উপর। হেলিকপ্টার থেকেও ছোড়া হয় টিয়ারশেল ও বুলেট। তবুও থেমে যায়নি তরুণ ছাত্ররা। জীবন বাজি রেখে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

১৮ই জুলাই কাজলা এলাকায় মিছিল থেকে ফেরার পথে পুলিশের গুলির মুখে পড়ে যায় আবদুল কাইয়ুম। অনবরত গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় কাইয়ুমের দেহ। সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সে। পুলিশের গুলির কারণে কেউ আগাতে পারছিল না কাইয়ুমকে একটু সহযোগিতা করতে। তার শরীর থেকে অনবরত রক্ত ঝরতে থাকে। রাস্তায় পড়ে থাকে কাইয়ুমের নিথর দেহ। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে কাইয়ুমকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, ততক্ষণে সে দুনিয়াতে আর নেই।

তার পিতার নাম আলাউদ্দিন এবং মাতা বিবি খোদেজা। শহিদ আবদুল কাইয়ুমের বড়ো ভাই আরব আমিরাতে থাকেন। মেজো ভাই কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। একমাত্র বোন রয়েছে বিবাহিত।



মো. হাসান

গেজেট নং : ৫২৫

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৯০

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী পৌরসভার কাঁশারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করে মো. হাসান ২০১২ সালের ১লা জুন। গ্রামের আলো-বাতাস গায়ে মেখে বেড়ে উঠে হাসান। এক দিকে বাবার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া, অপর দিকে বাড়িতে মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা, কোনো কাজে কখনো কোনো অবহেলা ছিল না হাসানের। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কাজ করত সদা-হাস্যোজ্জ্বল এই শিশুটি। তাই তো সে মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন সবার কাছে যেমন আদরের ছিল তেমনি প্রিয়পাত্র ছিল সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব আর শিক্ষকদের কাছেও।

৫ই আগস্ট ২০২৪ সাল। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আপামর জনসাধারণ রাস্তায় বিজয় মিছিলে নেমে পড়ে। মুখরিত উৎসুক জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ অতর্কিতভাবে জনতার উপর নির্বিচারে গুলি ছোড়ে। এই মিছিলের সাথে ছিল মো. হাসান। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। সেখানে বুলেটবিদ্ধ হয়ে শাহাদত বরণ করে শিশু শহিদ মো. হাসান।

হাসানের বাবার নাম মো. মামুন উদ্দিন, তিনি পেশায় হকার। মায়ের নাম শাহিন আক্তার গৃহিণী। তারা ছিল দুই ভাই দুই বোন। সে সবার বড়ো। ছোটো বোন জিনিয়া আক্তার সোনাইমুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে, ছোটো ভাই হোসেনের বয়স তিন বছর এবং ফাতেমা আক্তার নামে তার ছয় মাস বয়সি আরো একটি বোন রয়েছে।



ফারহান হুসাইন আলিফ, তৃতীয় শ্রেণি, রোজগার্ডেন হাই স্কুল, ঢাকা



সাজ্জাদ হোসেন শান্ত, অষ্টম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ



মো. আরাফাত হোসেন আকাশ

গেজেট নং : ৫২৭

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৯৫

গ্রামের অন্যসব কিশোরের মতোই প্রাণবন্ত ছিল মো. আরাফাত হোসেন আকাশ (১৬)। আকাশের জন্ম ১লা মার্চ ২০০৮ সালে নোয়াখালিতে। জীবিকার তাগিদে ক'মাস আগে বাবার সঙ্গে নোয়াখালী থেকে নারায়ণগঞ্জে আসে। আকাশ ওয়াসিতপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের নায়ায়াটি মুক্তিনগর এলাকায়, বাবার সঙ্গে ফলের ব্যাবসা করত ফুটপাতে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১লা জুলাই থেকে। রংপুরে শহিদ আবু সাঈদের শাহাদতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকারের এ আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। এক সপ্তাহ আগে আকাশের ছোটো ভাই আদনানকে ডাক্তার দেখানোর জন্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ভাইকে ডাক্তার দেখাতে পারছিল না কেউ। ২১শে জুলাই বেলা ১১ টায় ছোটো ভাই আদনান (৬) আবদার করে দোকান থেকে নাশতা এনে দিতে। ছোটো ভাইয়ের আবদার পূরণে বাসা থেকে বের হয় আকাশ। নাশতার সন্ধানে মহাসড়কের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ মুহুর্মুহু গুলির মাঝখানে পরে যায় সে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আকাশ চিৎকার করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। আহত আকাশকে আশপাশের লোকজনের সহায়তায় উদ্ধার করে বাবা আকরাম ছুটে যান এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই শাহাদত বরণ করে আকাশ। অরাফাতের বাবা মো. আকরাম ও মা লাইলী বেগম। তার এক বোন ও এক ভাই আছে। দুজনই শিক্ষার্থী। স্থায়ী ঠিকানা: ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।



শাহাদাত হোসেন শাওন

গেজেট নং : ৬৩৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ৯৬

ঢাকার পশ্চিম ধোলাইপাড় এলাকার বাসিন্দা শাহাদাত হোসেন শাওন পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে ১৪ই জুন ২০১০ সালে জন্মগ্রহণ করে। শাওন নূরে মদিনা আল আরাবিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল। কোরানে হাফেজ হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে নাযেরা ক্লাসে পড়ত।

শাওন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। পড়াশোনার ফাঁকে সে তার বাবার সাথে ব্যাবসায় সময় দিত। শাওনের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল। জনগণের বাধভাঙা উল্লাসে ৫ই আগস্টের বিজয় মিছিল বের হয় সারাদেশে। তখনও দেশের কোনো কোনো অংশে বর্বরতা চালায় পরাজিত শক্তি। বিজয় মিছিলে নির্মম গুলি চালায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। ৫ই আগস্টে শাওনের বাবার সাথে শাওনও বের হয় বিজয় মিছিলে। মিছিলটি যাত্রাবাড়ি আসতেই পড়ে যায় পুলিশে গুলির মুখে। সেদিন পুলিশের নির্মমতায় যাত্রাবাড়িতে শাহাদাত হোসেন শাওন ছাড়াও বহু মানুষ শহিদ হয়। শাওনদের মিছিল যাত্রাবাড়ি থানার সামনে আসতেই পুলিশ গুলি ছুড়তে থাকে। এসময় বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয় শাওন।

মো. বাছির আলম ও সামছুন নাহার বেগমের পাঁচ সন্তান, এদের মধ্যে শুধু শাওনই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল। শাহাদাত হোসেন শাওনের পরিবার খুবই অসচ্ছল। তার বাবা ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী। ফুটপাতে হালিম, ফুচকা এসব বিক্রি করে কোনোমতে সংসার চালায়। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- খাজুরিয়া (সরদার বাড়ি), ইউনিয়ন- খাজুরিয়া, থানা- সেনবাগ, জেলা- নোয়াখালী।



মো. মাহিন

গেজেট নং : ৬২৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ১০১

জুলাই বিপ্লবের গর্বিত সন্তান মো. মাহিন ১০ই আগস্ট ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করে। মাহিন শৈশব কাটিয়ে উঠার আগেই তার বাবা মারা যায়। শৈশবে শিশুদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য থাকে মাহিনের ক্ষেত্রে তা আর থাকেনি। শৈশবেই ধরতে হয় সংসারের হাল। সে একটি মুদির দোকানে কাজ করত।

১৮ই জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি শুরু হয়। ছাত্রদের বুকের রক্তে জেগে ওঠে বাংলাদেশ। অভিভাবক, নাগরিক, পেশাজীবী সবাই পাশে দাঁড়ায় ছাত্রদের আন্দোলনে। এদিন সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে মীর মুগ্ধের শাহাদতের ঘটনা। এদিন সংঘর্ষ বেশি হয় ঢাকায়। চট্টগ্রামের মূল পয়েন্ট ছিল বহদ্দারহাট, সেখানেও তুমুল উত্তেজনা চলতে থাকে। বহদ্দারহাটের একটি মুদি দোকানে কাজ করে মাহিন। সে প্রতিদিন ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। নির্যাতিত ছাত্রদের দেখে মাহিন আন্দোলনে নেমে পড়ে। দিনভর মাহিন ছাত্রদের সাথে মিছিলে ছিল, বিকেলে পুলিশ মিছিলে হামলা করে। এ সময় একটি বুলেট মাহিনের গায়ে লাগে। সাথে সাথে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সে। দ্রুত ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু পথেই শাহাদত বরণ করে মাহিন।

তার বাবা আমিন রসুল এবং মা রহিমা বেগম। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। শহিদ মাহিন ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মাহিনের স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- হারামিয়া, ইউনিয়ন- হারামিয়া, থানা- সন্দ্বীপ, জেলা- চট্টগ্রাম।

রংপুর বিভাগ



মো. সোহাগ

গেজেট নং : ৩৩২

আইডি : রংপুর বিভাগ ৮

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার বড়ো পাহাড়পুর গ্রামে ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে মো. সোহাগ। অর্থের অভাবে খুব বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি তার, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েই লেখাপড়ার ইতি টানে। অবশেষে পরিবারসহ ঢাকায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার কষ্টকে কিছুটা লাঘব করার জন্য ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি নেয়। সোহাগের শখ ছিল কবুতর পোষা। অল্প অল্প করে টাকা গুছিয়ে একজন বড়ো ব্যাবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন ছিল সোহাগের।

শিক্ষার্থীরা যখন শান্তিপূর্ণভাবে কোটা সংস্কার আন্দোলন করছিল সেই আন্দোলন দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে তৎকালীন সরকার। ১৭ই জুলাই থেকে কয়েকদিনে সারাদেশে দুইশ'রও বেশি প্রাণহানি ঘটে। সে সময় সরকার সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা সরকার পতনের অর্থাৎ এক দফার আন্দোলনে নামেন।

১৯শে জুলাই শুক্রবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এদিন জুম্মার পর দুপুর ৩ টায় উত্তর বাড্ডায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে এক বন্ধুর সাথে অংশগ্রহণ করে সোহাগ। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সোহাগ সামনের সারিতে চলে যায়। পুলিশ এসময় অতর্কিত গুলি চালায় নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর। মানুষ বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। এসময় রাস্তায় কয়েকজন ছাত্র আহত হয়ে পড়ে থাকে। আহতদের সহযোগিতা করার জন্য কারো এগিয়ে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। সোহাগ এবং আরো কয়েকজন আন্দোলনকারী আহতদের সহযোগিতায় এগিয়ে যায়। ভয়ভীতি দূর করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে সবাই। সোহাগ আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তাকে পার্শ্ববর্তী এ এম জেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্মরত ডাক্তার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে সেখানে সোহাগ শাহাদত বরণ করে। কাছে কেউ না থাকায় অনেক লাশের ভিতর সে হারিয়ে যায়। অবশেষে লাশের স্তুপের মধ্য থেকে তার বাবা পাঞ্জাবি দেখে তাকে শনাক্ত করতে পারেন। সোহাগের বাবা মো. রেজাউল রিকশাচালক। মা মোসা. সালমা বেগম গৃহিণী। বড়ো ভাই মো. সোহেল গার্মেন্টস কর্মী।



মো. জোবায়ের হোসেন

গেজেট নং : ৭১৪

আইডি: রংপুর বিভাগ ১৮

মো. জোবায়ের হোসেন লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। মাঝে মাঝে বাবার সাথে ইন্টেরিয়র ডিজাইন মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করত। তার জন্ম ১৩ই জুলাই ২০০৮। কিশোর জোবায়ের মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছিল। পরিশ্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছে।

৫ই আগস্ট ২০২৪। এ দিনেই বাংলাদেশের ইতিহাসে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। যখন ছাত্র-জনতা আনন্দ করতে থাকে তখন স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতা একটি ভবনের ৩য় তলায় ৬ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় ৬ জনের দেহ। সেই ৬ জনের মধ্যে শহিদ মো. জোবায়ের হোসেনও ছিল। রাত যত ঘনিয়ে আসে ৬ জনের পরিবারই তাদের খুঁজতে থাকে, কেউ ফেসবুকে, বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে খবর আসে, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে ৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে রাত ১২ টায়। সেনাবাহিনীর সহায়তায় লাশগুলো উদ্ধার করে লালমনিরহাট হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরদিন সকালে হাসপাতালে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে সেই পুড়ে যাওয়া ৬ জনের মধ্যে তাদের আদরের ছেলে জোবায়েরও আছে।

শহিদ জোবায়েরের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন, তার বড়ো ভাই জাকির হোসেন কোরানের হাফেজ। আর ছোটো বোন জেসমিন আক্তার ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। জোবায়েরের বাবা মো. জহিরুল ইসলাম ছিলেন ইন্টেরিয়র ডিজাইন মিস্ত্রী। মা মোসা. জিন্নাতুন নাহার একজন গৃহিণী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- বসুন্ধরা, লালমনিরহাট, মিউনিসিপালিটি, লালমনিরহাট।



মো. গোলাম রব্বানী

গেজেট নং : ২০৩

আইডি: রংপুর বিভাগ ৩৭

কুড়িগ্রাম জেলার কচাকাটা থানার শোভারকুটি গ্রামে ২০০৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে শহিদ মো. গোলাম রব্বানী। বাবার নাম মো. সাইদুল ইসলাম, মায়ের নাম মোসা. আমেনা বেগম। সে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে এবং পাশাপাশি দিনমজুরের কাজ করে। চার ভাই-বোনের মধ্যে সে ছিল তৃতীয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে ঢাকায় এসে রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে শহিদ গোলাম রব্বানী। ১৯শে জুলাই ২০২৪ শহিদ রব্বানী কাজ শেষ করে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা হয়। রামপুরা মেইন রোডের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া রব্বানী ও তিন বন্ধু শিকার হয় পুলিশের কালো থাবায়। গোলাম রব্বানী পুলিশের গুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়ে যাওয়ার সময় একটি গুলি তার ডান পায়ের উরুতে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে রব্বানী। স্থানীয় কয়েকজন তাকে বনশ্রী নাগরিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরদিন সকাল দশটায় একটি ভ্যান ভাড়া করে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রব্বানিকে। সেখানে ভর্তি করিয়ে অপারেশন করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। বিকেলের দিকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার আগে তার ব্যান্ডেজ খুলতেই প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সেখান থেকে বিকেল ৫টায় শ্যামলীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয় রব্বানীকে। অবস্থা খারাপ দেখে আইসিইউতে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা জানান অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে রব্বানী শাহাদত বরণ করে।



মো. আশিকুল ইসলাম

গেজেট নং : ৭৪৯

আইডি: রংপুর বিভাগ ৩৮

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার গোপালগঞ্জ ইউনিয়নের নরহরিপুর গ্রামে ২০০৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম। সে ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত নিবরাস ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ৯ম শ্রেণির ছাত্র এবং পাশপাশি হিফজও করত।

২০২৪ সালের জুন মাসে আদালত কর্তৃক বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থা বহাল হলে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। শহিদ আশিকুল ইসলাম প্রথম থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল। ১৯শে জুলাই ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজ শেষে মসজিদগুলো থেকে জনস্রোত বেরিয়ে আসে রাজপথগুলোতে। তাদের এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে গুলি চালাতে সরকারি বাহিনীগুলোর হাত কাঁপেনি। আশিক বয়সে ছোটো হলেও তার শারীরিক গঠন বেশ ভালো ছিল। রামপুরায় ছাত্রদের মিছিলে যখন পুলিশ হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালাতে শুরু করে, তখন দিগ্‌বিদিক শুন্য হয়ে দৌড়াতে থাকা কয়েকজন ছাত্রকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আশিক। তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর পর ছাত্র-জনতা আবার যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তখন এলোপাতাড়ি ছুড়তে থাকা একটি বুলেট এসে লাগে আশিকের মাথায়। সাথে সাথে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে আশিক। ধুলোয় ধূসরিত শুকনো রাজপথ সিক্ত হয় আশিকের রক্তে। যোগ দেন শহিদের মিছিলে।

আশিকের বাবা ফরিদুল ইসলাম, মা আরিশা আফরোজ। পারিবারিক সমস্যার কারণে মা তার দুই বছর বয়েসি একমাত্র ছেলে আশিককে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং সেলাইয়ের কাজ করে আশিককে বড়ো করতে থাকেন। আশিকের ৬ মাস বয়সি একটি ছোটো ভাই আছে, যাকে আশিক আদর করে 'চকলেট' ডাকত।



রবিউল ইসলাম রাহুল

গেজেট নং : ২৩৪

আইডি: রংপুর বিভাগ ৪২

রবিউল ইসলাম রাহুল ২০০৭ সালের ১২ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করে। রাহুল রানীগঞ্জ এহিয়া হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। পড়াশোনা আর খেলাধুলাই ছিল তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো রাহুল। দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের কোটাসংস্কারের আন্দোলন শুরু হলে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে রাহুলও তাতে জড়িয়ে পড়ে। কোটাসংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতেই ছিল তার সরব অংশগ্রহণ।

৪ঠা আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেয় রবিউল ইসলাম। দুপুরের সময় পর দিনাজপুর শহরের হাসপাতাল মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ অবস্থান নেয় চৌরাস্তা রেলক্রসিং এলাকায়, এসময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধাওয়া দিলে আন্দোলনকরীরা জজকোর্ট গেটে অবস্থান নেয়। পুলিশ জজকোর্ট গেট খুলে অনবরত গুলি ও টিয়ারশেল ছুড়তে থাকে। পরে পুলিশের ছররা গুলিতে আহত হয় রবিউল। তাৎক্ষণিক তাকে দিনাজপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার শরীর থেকে গুলি বের করেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসা শেষে বাসায় চলে আসে রবিউল। পরবর্তীতে আঘাতের জায়গায় সংক্রমণ হলে তাকে এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। আইসিইউতে তার শ্বাসকষ্ট হয়, রক্তচাপ খুব কম এবং জ্বরও ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১লা আগস্ট সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে শাহাদত বরণ করে রাহুল।

রাহুলের বাবা মোসলেম উদ্দিন এলাকায় মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মা ফরিদা খাতুন গৃহিণী। বড়ো দুই ভাই গার্মেন্টস কর্মী ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করে। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বিদুরশাই, রানীগঞ্জ বাজার, থানা: ফাজিলপুর, জেলা: দিনাজপুর।



আশরাফুল ইসলাম অন্তর

গেজেট নং : ৮৩৩

আইডি: রংপুর বিভাগ ৪৫

দিনাজপুর জেলার বিরল থানার করলা গ্রামে ২০০৯ সালের ১২ই মে আশরাফুল ইসলাম অন্তর জন্মগ্রহণ করে। শৈশবটা সেখানেই কেটেছে। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের কারণে মায়ের সাথে ঢাকার যাত্রাবাড়ী ডগাইর নতুন পাড়া এলাকায় চলে আসে। সেখানেই নতুন জীবন শুরু হয় অন্তর ও তার মায়ের। রাজধানীর নিউমার্কেটে একটি পোশাক কারখানায় স্বল্প বেতনে চাকরি নেন অন্তরের মা।

আশরাফুল ইসলাম অন্তর ডগাইর বাজার, ডেমরা, ঢাকার সিদ্দিক-ই-আকবর (রা:) ইন্সটিটিউটে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার টেকনিক্যাল জ্ঞান খুব ভালো ছিল। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে নিজেই ঠিক করে ফেলত। বাড়িতে বৈদ্যুতিক কোনো সমস্যা হলে নিজেই সমাধান করত। ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে স্কুল পালিয়ে আন্দোলনে যোগ দিত অন্তর। এজন্য একদিন ভীষণ বকাঝকা করেন তাঁর মা।

৫ই আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পদত্যাগে উল্লাসে ফেটে পড়ে সারাদেশের জনতা। রাজধানীসহ দেশের অলি-গলি থেকে বিজয় মিছিল বের হয়। তেমনই যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিজয় মিছিল বের করে স্থানীয় জনতা। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে অন্তর। বিজয়ের পরও চারিদিকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে পুলিশ বাহিনী। বিকাল ৫ টায় আশরাফুল ইসলাম অন্তর গুলিবিদ্ধ হয়, সাথে সাথে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর অন্তরকে পা দিয়ে চেপে ধরে গুলি চালায় তার মৃত্যু নিশ্চিত হলে দূরে ফেলে দেয় পুলিশ বাহিনী। অন্তরকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর মা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। বিজ্ঞপ্তি দেখে এক ব্যক্তি ফোন করে জানায়- 'আপনার ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের বাইরে পাওয়া গিয়েছে। আপনারা দ্রুত আসেন।' সেখানে গিয়ে লাশ বুঝে পান অন্তরের মা ও খালা। অন্তরের বাবার নাম মিজানুর রহমান, মায়ের নাম হামিদা বানু। গ্রামের বাড়ি: বানিয়াল আশলির চর উপজেলা, থানা- মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

ময়মনসিংহ বিভাগ



আব্দুল্লাহ আল মাহিন

গেজেট নং : ২৪

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ১

আব্দুল্লাহ আল মাহিনের জন্ম ১১ই জুলাই ২০০৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার চরপাড়া ইউনিয়নের পুরোহিত পাড়া গ্রামে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান মাহিন পড়াশোনা করত ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সের ১ম সেমিস্টারের ছাত্র ছিল। পড়াশোনায় মাহিন ছিল অত্যন্ত মেধাবী।

৪ঠা আগস্ট ২০২৪। উত্তরা আজমপুর মোড় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল। সেখানেই ছিল মাহিন এক সাহসী তরুণ, চোখে স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। পুলিশ ও ছাত্রলীগের সাথে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। আন্দোলনের উত্তপ্ত মুহূর্তে একপর্যায়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে পুলিশ। একটি বুলেট মুহূর্তেই যেন এক ভয়াবহ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসে মাহিনের জন্য। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত মাহিনকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা না পেয়ে অনেক চেষ্টা করে তাকে অন্য একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আইসিইউতে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শাহাদত বরণ করে মাহিন। পিতার নাম জামিল হোসেন ও মাতার নাম সামিরা জাহান মুনি। তার স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- পুরোহিত পাড়া, ইউনিয়ন- চরপাড়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- ময়মনসিংহ।



মো. জুবাইদ ইসলাম

গেজেট নং: ৬২৮

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ১৩

মো. জুবাইদ ইসলাম ২০০৯ সালের ১০ই জানুয়ারি ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার চামরুল্লাহ গ্রামের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ১০ ভাইবোনের মধ্যে শহিদ জুবাইদ ইসলাম ছিল অষ্টম। মাতা-পিতার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সন্তানকে পড়ালেখা করানোর সুযোগ হয়নি আর্থিক সমস্যার কারণে। ফলে অল্প বয়সেই জুবাইদকে মুদি দোকানে কাজ করতে হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অন্দোলনে ১৮ই জুলাই ২০২৪ পুলিশ ছাত্রদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করে। এই হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ২০শে জুলাই কারফিউ ভঙ্গ করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। পুলিশ এবং সরকারি দলের নেতাকর্মীদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে সেদিন সারাদেশ ছিল প্রতিবাদমুখর। ছাত্র-জনতার এই প্রতিবাদী আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী এবং সরকারি বাহিনী। শহিদ জুবাইদ ইসলাম সেদিন দোকান থেকে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে পুলিশের গুলির শিকার হয়। পুলিশের নিক্ষিপ্ত বুলেট বিদ্ধ হয় তার বুকে। পরিবার প্রথমে তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেনি। দোকান মালিক রাত নয়টার দিকে পরিবারের সদস্যদের কাছে মৃত্যুর খবর জানালে তারা ছুটে আসেন। জুবাইদের লাশ পেতে তাদের বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। জুবাইদের বাবা মো. আব্দুল আজিজ কুসুম এবং মা মোসা. নাছিমা আক্তার। এদের মধ্যে শুধু বড়ো ভাই লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতা করে। বাকি ভাইদের কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দোকানে কাজ করে।



মো. শাকিবুল হাসান সাজু

গেজেট নং: ৫৫৬

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ১৪

ময়মনসিংহের মুশুলী গ্রামে শাকিবুল ২০০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করে। সাজু ছিল তিন ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। হাস্যোজ্জ্বল এই ছেলেটিকে সবাই পছন্দ করত। সাজু কোরানের ১৫ পারার হাফেজ ছিল। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি দোকানে কাজ করত।

সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হলে নিজেকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি সাজু। পরিবারের বাধা সত্ত্বেও লুকিয়ে আন্দোলনে যোগ দিত। প্রতিদিনই আন্দোলন চলছিল। দিনটি ছিল আগস্টের ৫ তারিখ, কাউকে না জানিয়ে সেদিনও মিছিলে যোগ দেয় সাজু। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে আন্দোলন চলছিল। ৫ই আগস্ট দুপুরে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে। সারাদেশে তখন চলছিল জনতার উচ্ছ্বাস। তবে কয়েকটি স্থানে স্বৈরাচার পতনের পরও ঘাতক পুলিশ নিরীহ নিরস্ত্র মুক্তিকামী জনতার ওপর গুলি করে। তেমনি একটি স্থান ছিল গাজীপুর। বিকেল ৫ টার দিকে বিজয়োল্লাসরত ছাত্র-জনতার ওপর বিকট শব্দে টিয়ারশেল ও মুহুর্মুহু গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশ। একটি গুলি এসে আঘাত করে সাজুর শরীরে। ছোট্ট শরীরটিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় ঘাতকের বুলেট।

পরিবার ঘটনাটি জানতে পারেন সন্ধ্যায়। দিশেহারা হয়ে ছুটে যায় শহিদ সাজুর বাবা। শ্রীপুর হাসপাতাল থেকে মাওনা নেওয়ার পথে ছেলের শরীরে হাত দেন তিনি। শরীর একেবারে ঠান্ডা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকে না- তার প্রিয় সন্তান আর বেঁচে নেই। শহিদ সাজুর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৫ বছর।

শহিদ সাজুর লাশ তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের নয়াপাড়ায় নেওয়া হয়। জানাজা শেষে তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। সাজুর বাবা মো. খোকন মিয়া, মা মোসা. হোসনা বেগম। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- মুশুলী নয়াপাড়া, ইউনিয়ন- মুশুলী, থানা- নান্দাইল, জেলা- ময়মনসিংহ।



সায়মা আঞ্জুম বিভা, চতুর্থ শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ স্কুল, ঢাকা



রওজানা ইসলাম, পঞ্চম শ্রেণি, নয়া শুভাড্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা



সামিদ হোসেন

গেজেট নং: ৯২

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৩০

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার তেঘুরী গ্রামে ২২শে আগস্ট ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করে সামিদ হোসেন। পিতা মো. ফরহাদ আলী সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন এবং মা শিল্পী আক্তার গৃহিণী। মা-বাবা আর ছোটো ভাই আকিম হোসেনকে সাথে নিয়ে তারা টঙ্গির গাজীপুরের চেরাগ আলীতে বাস করত। সামিদ পড়াশোনা করত কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় বর্ষে (চতুর্থ সেমিস্টার)।

সামিদ নিয়মিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করত। ৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ডাকে 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সামিদ বাবার সঙ্গে সকাল থেকে 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে উত্তরার আজমপুর বিএনএস সেন্টারের সামনে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ শুরু হয়। বিকাল পাঁচটার দিকে হঠাৎ পুলিশের ছোড়া গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয় সামিদ। পরে তাকে উদ্ধার করে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে শহিদ ঘোষণা করেন।

সামিদ ছিল বাবার আঁধার ঘরের মানিক। স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে তাই বাবা রাতদিন পরিশ্রম করতেন। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- তেঘুরী, পদুরবাড়ি ইউনিয়ন- মানকোন, থানা- মুক্তাগাছা, জেলা- ময়মনসিংহ।



আহাদুন

গেজেট নং: ২৮২

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৩৫

নেত্রকোনার শ্যামপুরে আহাদুন ১লা ডিসেম্বর ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। আহাদুন হাজী সিকান্দার আলী টেকনিক্যাল স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকে দমাতে মানুষদের ঘরবন্দি করার পরিকল্পনায় সরকার জারি করে কারফিউ। আহাদুনরা বসবাস করত ঢাকার মেরুল বাড্ডা এলাকায়। এই এলাকাতে হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়। হেলিকপ্টারের গুলিতে আহাদুনও ১৮ই জুলাই আহত হয়ে ১৯শে জুলাই রাত ১০টায় শহিদ হয়।

শহিদ আহাদুনের লাশ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার বাবা। রাতভর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ছেলের লাশ খুঁজতে থাকেন, না পেয়ে নিরাশ হয়ে সারারাত কাটানোর পর ১৯শে জুলাই দুপুর বারোটায় বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর লাশের সন্ধানে ঘুরতে থাকেন থানায় থানায়। ১৯শে জুলাই থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন লাশ। অবশেষে ২১শে জুলাই আহাদুনের লাশ খুজে পায় তার বাবা।

শহিদ আহাদুনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল সাত। আর্থিকভাবে অসচ্ছল বাবার ছোট্ট একটি মুদি দোকান মেরুল বাড্ডার গলির এক কোণে ছিল। বাবাই ছিল আহাদুনদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। আহাদুনের বাবা মো. মজিবুর রহমান, মা মোছা. কল্পনা আক্তার। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- শ্যামপুর, ইউনিয়ন- বিষমপুর, থানা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোনা।



সোহাগ মিয়া

গেজেট নং: ২৮৩

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৩৬

নেত্রকোনা জেলায় কমলাকান্দা থানার বড়খাপন গ্রামে মো. সোহাগ মিয়া ১লা আগস্ট ২০০৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। মা শমলা আক্তার গৃহিণী। সোহাগ বাবার সাথে ঢাকা শহরে রিকশা চালাত। চার ভাইবোনের মাঝে সে ছিল সবার বড়ো। দেশব্যাপী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, বাংলা ব্লকেড আর কমপ্লিট শাটডাউনের মুখে সরকার বেসামাল হয়ে পরে। এ আন্দোলনকে দমাতে জারি করে কারফিউ। দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারের সন্তান মো. সোহাগ মিয়া। আন্দোলন সংগ্রামের মাঝেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রিকশা নিয়ে বের হতো।

১৯শে জুলাই ২০২৪ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর সোহাগ রিকশা নিয়ে বের হয়। ঢাকার নতুন বাজার ফরাজি হাসপাতালের সামনে অসংখ্য ছড়ড়া গুলির মধ্যে একটি গুলি কান দিয়ে প্রবেশ করে তার মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ এবং মগজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু কোনোভাবেই পরিবার মেনে নিতে পারছে না। জীবিকার তাগিদেই বাবা মো. শাফায়েত হোসেন ঢাকা শহরে এসেছিলেন। যে শহর ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেই শহরে তিনি আর থাকতে চান না। স্বপরিবারে আবার গ্রামে ফিরে গেছেন। বেঁচে থাকার তাগিদে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বেছে নিয়েছেন কৃষিকাজ। সোহাগের মায়ে নাম শমলা আক্তার



জোবায়েদ

গেজেট নং: ৪৯৩

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৪৬

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক সাহসী তরুণ শহিদ জোবায়েদ। কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার গকুল নগর গ্রামে ২০০৭ সালের ৬ই জুলাই জন্মগ্রহণ করে সে। বাবা নাজির হোসেন সি.এন.জি চালক এবং মা হোসনারা বেগম একজন গৃহিণী। জোবায়েদ ছোটোবেলা থেকেই মেধাবী ছিল কিন্তু পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে তার শিক্ষাজীবন বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারেনি। সপ্তম শ্রেণির পর পড়াশোনা বন্ধ করে তাকে কাজের পথে নামতে হয়। জীবিকার তাগিদে কাঠমিস্ত্রির কাজ বেছে নেন। গ্রামের বাড়ি গকূল নগর, আগা নগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে জোবায়েদ ঢাকায় এসেছিল কাজের জন্য। থাকত ঢাকার শনির আখড়াতে। এখানেই কাজে যোগ দেয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রথম থেকেই সে ছিল সক্রিয়। আন্দোলনের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। কিন্তু মা হোসনারা বেগম ছেলের আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সবসময়ই চিন্তায় থাকতেন। মা তাকে প্রথমবার আন্দোলন থেকে খুঁজে বের করে আনলেও সে থেমে থাকেনি। ১৯শে জুলাইয়ের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর আবার জোবায়েদ ৫ই আগস্টের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করে।

৫ই আগস্ট, সকাল ১০টায় জোবায়েদ বাসা থেকে বের হয়। প্রথমে দোকানে যায় কাজের জন্য কিন্তু ১টার দিকে সে যাত্রাবাড়ীর কাজলার দিকে রওনা দেয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। দুপুর ২টার দিকে কাজলায় যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভারের মুখে স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশের গুলি তার মাথায় এবং চোখে আঘাত লাগে। জোবায়েদের শহিদ হওয়ার খবর পরিবারের কেউ জানত না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে তার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। সেখান থেকে পরিবার গভীর রাতে জোবায়েদের লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় এবং সেখানে দাফন করা হয়।



সাফওয়ান আখতার

গেজেট নং: ১২৩

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৫৩

জামালপুর জেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সবুজ শ্যামল গ্রাম রঘুনাথপুরে জন্মগ্রহণ ২০০৯ সালের ২রা অক্টোবর করে সাফওয়ান আখতার সদ্য। বাবা মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং মা খাদিজা বিন জুবায়েদ সমাজ সেবিকা। সদ্য সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। সদ্যের স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। স্কুলের বিজ্ঞান মেলায় বরাবরই ছিল তার সরব উপস্থিতি। ঝোঁক ছিল খেলাধুলায়, ছবি আঁকায় আর এনিমেশন বানানোতে। সদ্যের বড়ো বোন আতিয়া জামান তিশমা একজন ছাত্রী।

৫ই আগস্ট ২০২৪, শত শত মানুষের জীবনের বিনিময়ে রক্ত রাঙা পিচ্ছিল পথ বেয়ে আসে এদেশের মুক্তি। নতুন এক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এই দিন দুপুর একটার দিকে বাবার সাথে বিজয় মিছিলে অংশ নেয় সদ্য। বাবা ছেলে মিলে হেঁটে হেঁটে চলে যায় সাভারের পাকিজা স্ট্যান্ডে, বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাবার সাথেই ছিল। এরপর বন্ধুদের সাথে চলে যায় পুলিশ বাহিনী আর গুলি করবে না এই ভরসায়। রাত ৯টায়ও সদ্য ফিরে না আসায়, বাবা খুঁজতে খুঁজতে রাত সাড়ে নয়টার দিকে চলে যান এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই স্ট্রেচারে পড়েছিল সদ্যের লাশ। একটা গুলি লেগেছিল ওর হাতে অন্যটা বুকের পাঁজরে ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করে শহিদ সাফওয়ান আখতার সদ্য।



মো. লিটন

গেজেট নং: ৮২৪

আইডি: ময়মনসিংহ বিভাগ ৫৫

জামালপুর জেলার চিনাডুলি ইউনিয়নের খামারিয়া পাড়ায় মো. লিটন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬ই জুলাই ২০০৬ সালে। বাবা মো. সবুর মন্ডল পেশায় একজন কৃষক এবং মা মোছা. জাম্বি বেগম গৃহিণী। সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোটো ছিল লিটন।

শহিদ মোহাম্মদ লিটন ছিল গার্মেন্টস কর্মী, নিজে আয় করে বাবাকে সহায়তা করত। ২০শে জুলাই ২০২৪ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারের কিছু নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঢাকার বাড্ডা এলাকায় বিক্ষোভ করছিল। সকাল সাড়ে দশটার দিকে লিটন বাড়ি থেকে বের হয়। অনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে মধ্য বাড্ডার ইউলুপের কাছে অবস্থান করছিল শিক্ষার্থীরা। সেখানে লিটনও ছিল তারা বাড্ডা এলাকার রাস্তায় অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীদের হটাতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ফলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। তখন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের একটি গুলি লিটনের মাথায় আঘাত করে। গুলিটি এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাজে পরিস্থিতির কারণে তাকে হাসপাতালে তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া যায়নি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অক্সিজেন দিলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের শাহাদত বরণ করে লিটন।

সাত ভাইবোনের মধ্যে মো. লিটন ছিলেন সবার ছোটো ও অতি আদরের। প্রতিবেশী ও গ্রামের লোকেরা শহিদ লিটনকে একজন বিনয়ী ও ভালো মনের মানুষ হিসেবে জানত। লিটনের এক ভাই প্রবাসী, ভাই গার্মেন্টস কর্মী, আরেক ভাই মাদ্রাসার ছাত্র। বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।



মো. জুনায়েদ, তৃতীয় শ্রেণি, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা



শাহিনা আলম, ৭ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, বাসাবো, ঢাকা



আদনান তালুকদার তন্ময়, সপ্তম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর সরকারি মডেল স্কুল, ঢাকা

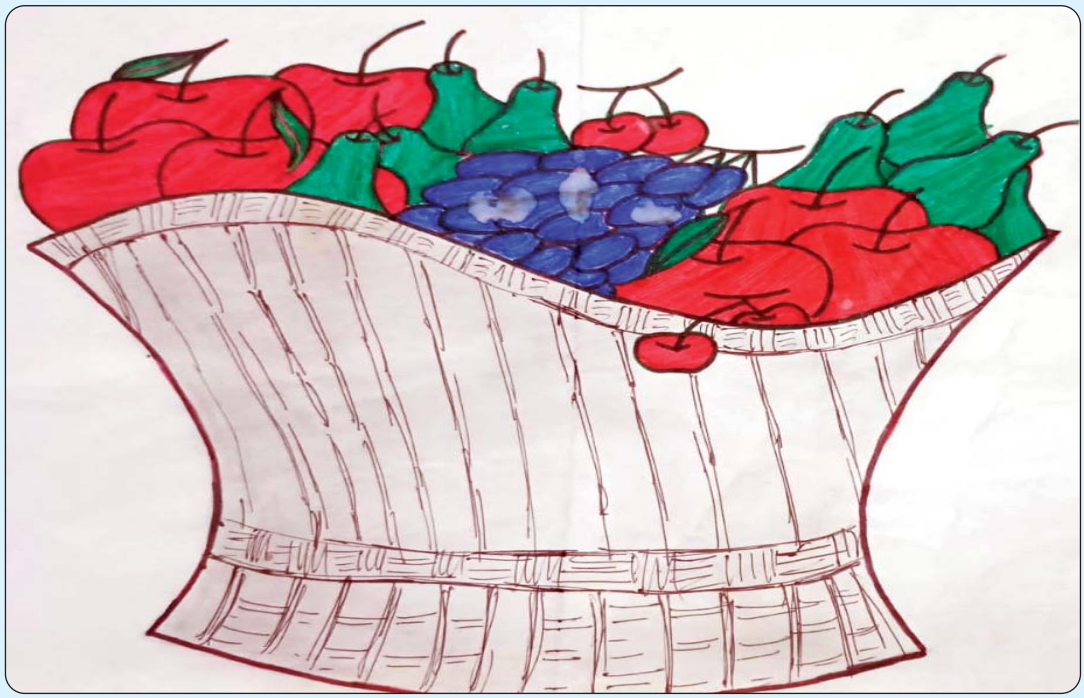

মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ, তৃতীয় শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-1-2. July-August 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



দেশের প্রথম 'জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা